

মনোবিদ্যা

প্রথম অধ্যায়

মনোবিজ্ঞানের স্বরূপ

১। মনোবিজ্ঞানের দৃষ্টিভঙ্গী (Psychological point of view) :

মনোবিজ্ঞান ‘মন’ সম্বন্ধে আলোচনা করে। আমরা সকলেই মনোবিশিষ্ট জীব এবং প্রত্যেকেই নিজের মনকে প্রত্যক্ষভাবে অল্পবিস্তর জানিতে পারি বলিয়া বিশ্বাস করি। এইজন্য মনঃ-সম্বন্ধীয় কোন আলোচনা নিতান্ত সাধারণ ব্যাপার বলিয়া আপাতদৃষ্টিতে মনে হয়। কিন্তু মনের স্বরূপ কি? দেহ ও মনের সম্বন্ধ কি? মনের প্রকাশ কিসের মাধ্যমে হয়? মনকে জানিবার পদ্ধতি কি? — এই সকল প্রশ্ন যতই উদ্ভূত হয়, ততই আমরা বুঝিতে পারি যে, মনঃ-সম্বন্ধীয় আলোচনা নিতান্ত জটিল। মনের রহস্য উদ্ঘাটন করিতে হইলে একটি সুচিন্তিত, সুনির্দিষ্ট পন্থা অবলম্বন করা উচিত। সেইজন্য সর্বাগ্রে প্রশ্ন উঠে : মনোবিজ্ঞানের দৃষ্টিভঙ্গী কিরূপ হওয়া উচিত?

একদিন ছিল যখন মনোবিজ্ঞান দর্শনের একটি বিশেষ শাখা মাত্র ছিল। তখন মনোবিজ্ঞান তাত্ত্বিক আলোচনার প্রাধান্য ছিল; মনোবিজ্ঞানের মধ্যে ‘আত্মা’-সম্বন্ধীয় দার্শনিক আলোচনাই বিশেষ স্থান পাইত। আজ মনোবিজ্ঞান দর্শনশাস্ত্র হইতে পৃথক্ হইয়া ‘বিজ্ঞান’ হিসাবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে।^১ বিজ্ঞান অর্থে এখানে অভিজ্ঞতা-মূলক (empirical) ও পরীক্ষণমূলক (experimental) বিজ্ঞান বুঝিতে হইবে। সুতরাং আধুনিক মনোবিজ্ঞানের দৃষ্টিভঙ্গী হইল বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী।

১ মনোবিজ্ঞান ‘স্বাধীন’ বিজ্ঞান হিসাবে নিতান্ত নবীন; এবং এইভাবে ইহা কতদূর সার্থক হইয়াছে, সে সম্বন্ধে মনোবিদগণের মধ্যেই মতভেদ রহিয়াছে।

এখন প্রশ্ন হইল : এই বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গীর বৈশিষ্ট্য কি কি ? এই প্রশ্নের উত্তরদান করিতে হইলে প্রথমে বিজ্ঞান-লব্ধ জ্ঞান ও সাধারণজ্ঞানের মধ্যে পার্থক্য বুঝিতে হইবে। উভয়েই পারিপার্শ্বিক জগৎ-সম্বন্ধীয় জ্ঞান হইলেও উহাদের মধ্যে পার্থক্য বর্তমান। বিজ্ঞান হইল প্রকৃতির কোন বিশেষ বিভাগ লইয়া সূষ্ট, সামঞ্জস্যপূর্ণ যথাযথ আলোচনা। বিজ্ঞান-লব্ধ জ্ঞান যথার্থ (accurate) এবং বস্তুনিষ্ঠ (factual) এবং উহার মধ্যে অসার কল্পনা (vain speculation)-এর স্থান নাই। সাধারণ জ্ঞানে সকল সময় যথার্থ ও বস্তুনিষ্ঠতা থাকে না—উহা অনেক সময় কল্পনাশ্রয়ী হয়। বিজ্ঞানে প্রাকৃত ঘটনা (natural event)-কে অতিপ্রাকৃত (supernatural) দ্বারা ব্যাখ্যার প্রচেষ্টা থাকে না ; কিন্তু সাধারণ জ্ঞানে অনেকক্ষেত্রে ঐরূপ করা হইয়া থাকে। বৈজ্ঞানিক তাঁহার আলোচ্য বিষয়বস্তুকে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্মভাবে পর্যালোচনা করেন ; কিন্তু সাধারণজ্ঞানের ক্ষেত্রে আমরা বাহ্যিক স্থূল আকৃতি লইয়া অনেক সময় সন্তুষ্ট থাকি। বৈজ্ঞানিক যখন সত্যনির্ধারণের চেষ্টা করেন, তখন তিনি নিরপেক্ষ মনোভাব (impartial attitude) গ্রহণ করেন, অর্থাৎ তিনি তাঁহার অনুসন্ধানকে ব্যক্তিগত আশা-আকাঙ্ক্ষা বা একদেশদর্শিতা দ্বারা প্রভাবিত হইতে দেন না। সাধারণ জ্ঞানের ক্ষেত্রে ঐরূপ দৃঢ়তা ও সাবধানতা সচরাচর অবলম্বন করা হয় না। বৈজ্ঞানিক বিশেষ বিশেষ বস্তু পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে এক একটি সাধারণ নিয়ম (general law) আবিষ্কারের চেষ্টা করেন ; কিন্তু সাধারণ জ্ঞানের ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, আমরা বিশেষ কোন বস্তু ও উহার ব্যাখ্যা লইয়া সন্তুষ্ট থাকি। বিজ্ঞান-লব্ধ জ্ঞান সুসংবদ্ধ এবং ইহার কারণ এক এক দল বৈজ্ঞানিক এক একটি উদ্দেশ্য লইয়া সুগঠিত পরিকল্পনা গ্রহণপূর্বক তাঁহাদের আলোচনায় প্রবৃত্ত হন।^২ সাধারণজ্ঞানে ইহার অভাব আছে—উহা অধিকাংশ সময় সুসংবদ্ধ ও সামঞ্জস্যপূর্ণ নহে এবং উহার মধ্যে পূর্বপ্রকল্পিত উদ্দেশ্য-জনিত ঐক্যের অভাব আছে।

এই লক্ষণগুলি যদি বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গীর বৈশিষ্ট্য হয়, তাহা হইলে **বিজ্ঞান হিসাবে মনোবিজ্ঞান সত্যশ্রয়ী, বস্তুনিষ্ঠ, অসারকল্পনা-বিমুক্ত,**

২ টিচনারের (E. B. Titchener) ভাষায় : "...what holds a science together, and brings its observations into relation, is just the fact that all the work has been done under the guidance of the same principles and from the same point of view." (A Text-book of Psychology, p. 4).

সুপারিকল্পিত এবং রীতিসম্মত হইবে। উহা বাস্তব মানসিক ঘটনা-গুলিকে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পর্যবেক্ষণ করিয়া সাধারণসূত্র (general principles) বা সার্বিক নিয়ম (universal laws) আবিষ্কারের চেষ্টা করিবে।

মনোবিজ্ঞান বিষয়বস্তু মন, এবং মন বাহ্য-ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য দ্রব্যবিশেষ নহে। মনের প্রকাশ দেহের মাধ্যমে ঘটে। একমাত্র নিজের মনকেই প্রত্যক্ষভাবে জানা সম্ভব এবং অপরের মনকে অনুমানের মাধ্যমে জানিতে হয়।^৩ এইজন্য বিজ্ঞানরূপে স্বীকৃতিলাভের পরও মনোবিজ্ঞান দৃষ্টিভঙ্গী লইয়া বিরোধের অবকাশ থাকিয়া গিয়াছে।

সামরা কোন বিশেষ সম্প্রদায়ভুক্ত না হইয়া এখানে মনোবিজ্ঞান দৃষ্টিভঙ্গীর কয়েকটি বৈশিষ্ট্যের ইঙ্গিত দান করিব।

(ক) মনোবিজ্ঞান দৃষ্টিভঙ্গী ব্যক্তি-কেন্দ্রিক (individualistic)। বিজ্ঞান হিসাবে ‘নিরপেক্ষ’ হইলেও ইহার আলোচ্য বিষয়বস্তু, অর্থাৎ মানসিক ঘটনা, ব্যক্তি-মন হইতে সংস্রবহীন হইতে পারে না। যে কোন মানসিক অবস্থা বা ক্রিয়া পর্যালোচনা করিতে হইলে উহাকে ব্যক্তি-বিশেষের মানসিক অবস্থা বা ক্রিয়া হিসাবে পর্যবেক্ষণ করিতে হইবে।^৪

(খ) এক একটি মানসিক ঘটনার একটি করিয়া ‘সামগ্রিকরূপ’ আছে। সেইজন্য আলোচনার সুবিধার জন্ত উহাদের বিশ্লেষণ করিলেও বিশ্লেষণের মধ্যেই আলোচনা সমাপ্ত রাখা যায় না; ঐরূপ করিলে মানসিক ঘটনাসমূহের স্বরূপকে বিকৃত করা হইবে। এইজন্য মনোবিজ্ঞান আলোচনাকালে বিশ্লেষণ (analysis) ও সংশ্লেষণের (synthesis) সমন্বয়-সাধন বাঞ্ছনীয়।^৫

৩ ম্যাকডুগ্যাল্ বলেন : “The structure of the mind is a conceptual system that we have to build up by inference from the data of the two orders, facts of behaviour and facts of introspection.” (*An Outline of Psychology*, p. 42).

৪ বর্তমান অধ্যায়ের ৪র্থ অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য।

৫ টিচনার প্রমুখ অবয়ববাদী মনোবিদগণ (structuralists) মানসিক অবস্থাগুলিকে সরল উপাদান (simple elements)-এ বিশ্লেষণ করাকেই মনোবিজ্ঞান প্রধান করণীয় কার্য মনে করিতেন। টিচনার বলেন : “The aim of the psychologist is threefold. He seeks (1) to analyse concrete (actual) mental experience into its simplest components, (2) to discover how these elements combine, what are the laws which govern their combination, and (3) to bring them into connection with their physiological (bodily) conditions.” (*An Outline of Psychology*, p. 15)। বর্তমানকালের অধিকাংশ মনোবিৎই অবয়ববাদের বিরোধী এবং ক্রিয়াবাদ (functionalism)-এর সমর্থক। (অবয়ববাদ ও ক্রিয়াবাদের পার্থক্য ৪র্থ অধ্যায়ে আলোচিত হইয়াছে।)

(গ) মনের প্রকাশ যেহেতু দেহের মাধ্যমে ঘটয়া থাকে, সেই হেতু দৈহিক প্রকাশগুলির পর্যবেক্ষণ প্রয়োজন; কিন্তু তাই বলিয়া মনকে অস্বীকার করিয়া মানুষকে যন্ত্রবিশেষে রূপান্তরিত করা চলিবে না।^৬

(ঘ) মানসিক ঘটনার কারণ নির্ধারণের জন্ত পূর্বগামী অবস্থাসমূহ (antecedent condition) অনুসন্ধান করিলেই পর্যাপ্ত হইবে না। মন নিষ্ক্রিয় পদার্থ নহে—উহা ক্রিয়াশীল সত্তাবিশেষ। এইজন্ত মানসিক ঘটনা-সমূহের ব্যাখ্যাকালে উহার কী উদ্দেশ্য সাধনের বা কোন্ লক্ষ্যে পৌঁছিবার প্রচেষ্টা করিতেছে তাহাও দেখিতে হইবে।^৭

(ঙ) বিজ্ঞান হিসাবে মনোবিজ্ঞা বাস্তব পর্যবেক্ষণ বা পরীক্ষণের মাধ্যমে উপাত্ত (data) সংগ্রহ করে। উপাত্ত-সংগ্রহকালে উহাদের অর্থ (meaning), তাৎপর্য ও ত্তোতনা (significance) এবং মূল্যবোধ (value-sense) একেবারে অগ্রাহ্য করিলে চলিবে না, কারণ এইগুলি মানুষের মনে প্রেরণা যোগাইয়া থাকে।^৮

(চ) বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী গ্রহণ করিয়া মনোবিজ্ঞা যখন প্রগতির পথে অগ্রসর হয়, তখন সে মানসিক ঘটনাগুলির পরিমাণগত ব্যাখ্যা দানের (quantitative explanation) চেষ্টা শুরু করে। তাই বলিয়া মনো-রাজ্যের ঘটনা ব্যাখ্যা করিবার জন্ত কেবলমাত্র পরিমাণের ও সংখ্যার সাহায্য লওয়া সম্ভব নহে, কারণ মন পরিমাণ-সাপেক্ষ পদার্থ নহে। এইজন্ত মানসিক ঘটনাসমূহকে ‘গুণগত দৃষ্টিভঙ্গী’ (qualitative standpoint) হইতেও ব্যাখ্যা করিতে হইবে এবং মানসিক ঘটনাগুলির মাধ্যমে মন কোন্ অর্থ প্রকাশ করিতে চাহিতেছে তাহা নিরূপণ করিতে হইবে।^৯

৬ চেষ্টিতবাদ (Behaviorism)-এর সমর্থক ওয়াটসন্ (Watson) মনকে বাদ দিয়া যান্ত্রিকতাবাদের ভিত্তিতে মনোবিজ্ঞা রচনার প্রয়াস করেন। (৪র্থ অধ্যায়, পৃ: ৯৬-১০৪ দ্রষ্টব্য)।

৭ উদ্দেশ্য-সাধনবাদ (৪র্থ অধ্যায়, পৃ: ১০১-৩৫) দ্রষ্টব্য।

৮ টিচনার মনোবিজ্ঞার আলোচনাক্ষেত্র হইতে ‘অর্থ’ ইত্যাদি বহির্ভূত রাখার সমর্থক ছিলেন। সাম্প্রতিককালের লেখকগণ (যথা, ম্যাকডুগাল, কফ্কা ইত্যাদি) ইহা সমর্থন করেন না। তুলনীয়: “A psychology which has no place for the concepts of meaning and value cannot be a complete psychology.” (Koffka, *Principles of Gestalt Psychology*, p. 19).

৯ কফ্কা মনে করেন যে, পরিমাণবাদ ও গুণবাদ, এই দুই দৃষ্টিভঙ্গীর মধ্যে মূলগত পার্থক্য নাই। তিনি বলেন: “In my opinion this famous antithesis of quantity and

(ছ) মনের অন্ততম বৈশিষ্ট্য হইল যে, চেতনার (consciousness) ক্ষেত্র অতিক্রম করিয়া মনের প্রসার। বাস্তবিক মনোরাজ্যের অল্প অংশকেই চেতনা অধিকার করিয়া আছে এবং মনের উপর নিজ্ঞানস্তর (unconscious)-এর প্রভাব অপরিমিত। সুতরাং মনোবিজ্ঞান যখন কোন মানসিক ঘটনাকে ব্যাখ্যা করিবে, তখন কেবল চেতন-রাজ্যের অভিজ্ঞতার মধ্যে সকল সময় সীমাবদ্ধ থাকা সমীচীন হইবে না; প্রয়োজন হইলে নিজ্ঞানস্তরেও কারণ আবিষ্কারের জন্য অনুসন্ধান কার্য চালাইতে হইবে।^{১০}

(জ) ব্যক্তি-বিশেষকে পর্যবেক্ষণ করিবার সময় তাহাকে সমাজ হইতে সম্পূর্ণভাবে বিচ্ছিন্ন করিয়া দেখা যায় না। সামাজিক পরিবেশের মধ্যেই ব্যক্তি-মনের প্রকাশ ঘটে।^{১১} ব্যক্তি-বিশেষের প্রত্যক্ষ, আবেগ, ইচ্ছা ইত্যাদি যাহা কিছুই পর্যবেক্ষণ করা যাউক না কেন, তাহাতেই সমাজ-মনের প্রভাব দেখা যায়। সুতরাং ব্যক্তি-মনকে আলোচনা করিবার সময় সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গীর উপরও গুরুত্ব আরোপ করিতে হইবে।

২। মনোবিজ্ঞান বিষয়-বস্তু (Subject-matter of Psychology) :

মনোবিজ্ঞান মনের কথা আলোচনা করে। মনের প্রকাশ বিভিন্নভাবে হয় এবং মনোবিজ্ঞান মনের এই বিভিন্ন প্রকাশ লইয়া আলোচনা করে। মনের সুপরিষ্কৃত প্রকাশ ঘটে মানুষের মধ্যে এবং এইজন্য বলা যাইতে পারে যে, মানুষের মনই মনোবিজ্ঞানের প্রধান আলোচ্য বিষয়। মানুষ সামাজিক ও প্রাকৃতিক পরিবেশের মধ্যে বিচরণ করে এবং এই পরিবেশের বাহিরে তাহার সম্পূর্ণ স্বাধীন বা পৃথক্ সত্তা নাই। ব্যক্তি-বিশেষ এবং তাহার

quality is not a true antithesis at all.” মনোবিজ্ঞান বা Psychology সম্বন্ধে তিনি বলেন : “It may be perfectly quantitative without losing its character as a qualitative science.” (*Op. cit.*, pp. 13 & 15).

১০ মনের উপর নিজ্ঞানস্তরের প্রভাবের প্রতি আধুনিককালে বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করেন ফ্রয়েড (Freud) ও তাহার অনুগামীগণ। (৪র্থ অধ্যায়, পৃ: ১০৯-১১৬ দ্রষ্টব্য)।

১১ উড্‌ওয়ার্থ বলেন : “From the psychological point of view, the human being is a ‘social animal’. He is a biological organism dealing with an environment that is largely social.” (*Psychology*, 12th. Ed., p. 589).

পরিবেশ এই দুইয়ের পারস্পরিক ক্রিয়ার ফলেই ‘সমগ্র মানুষ’ এবং মনোবিজ্ঞান যখন মানুষের মন লইয়া আলোচনা করে, তখন এই পরিপ্রেক্ষিতেই ইহা মানুষকে বিচার করে। [১ম অনুচ্ছেদ (জ) দ্রষ্টব্য]

মানুষ ও তাহার পরিবেশ পরস্পরের উপর কিরূপ ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া করে দেখা যাউক। বাহিরের জগৎ মানুষের পঞ্চেন্দ্রিয়ার উপর কেবলই প্রভাব বিস্তার করিতেছে এবং ফলে বিভিন্ন বস্তু সম্বন্ধে মানুষের প্রতীতি ঘটতেছে ; এইভাবে বহির্জগৎ সম্বন্ধে সে জ্ঞান আহরণ করে। আবার জ্ঞান আহরণ করিয়াই সে নিশ্চেষ্ট হইয়া বসিয়া থাকে না। তাহার মনে কতকগুলি অনুভূতি জাগরিত হয় এবং প্রেরণার সৃষ্টি হয়। ইহারই ফলে ঘটে কার্যের অভ্যুদয়। এই কার্যগুলি সাধারণতঃ অনিয়মিত বা এলোমেলো নহে। বাহ্য পরিবেশের সহিত নিজেকে মানাইয়া লইবার জন্ত মানুষ কার্য করে। এই কার্যগুলিকে বলা হয় প্রতিযোজক (adaptive) ক্রিয়া।

একটি উদাহরণ লওয়া যাউক। ক্লাসে অধ্যাপক বক্তৃতা করিতেছেন এবং ছাত্র-ছাত্রীরা তাহা শুনিতেছে। এখানে অধ্যাপক যাহা বলিতেছেন এবং বোর্ডে যাহা লিখিতেছেন, সে সম্বন্ধে তাহাদের জ্ঞান জন্মিতেছে যথাক্রমে শ্রবণেন্দ্রিয় এবং দর্শনেন্দ্রিয়ার মাধ্যমে—ইহা হইল প্রত্যক্ষজ্ঞান। আবার সঙ্গে সঙ্গে কতকগুলি অনুভূতিও জাগিতেছে, যেমন, বক্তৃতা যদি ভাল লাগে, তাহা হইলে ছাত্র-ছাত্রীদের মনে প্রীতির অভ্যুদয় হইবে বা স্বথকর অনুভূতি জাগিবে, নহিলে একটা বিরক্তির ভাব আসিবে ; আবার কেহ কেহ বা সম্পূর্ণ উদাসীন থাকিবে। এই সমস্ত অনুভূতির সঙ্গে সঙ্গে আসিবে প্রতিযোজক ক্রিয়া—যেমন, কেহ বা স্থিরচিত্তে বক্তৃতা শুনিলে এবং হয়ত’ বক্তৃতার সারাংশ লিখিয়া লইবার চেষ্টা করিবে ; আবার কেহ বা বিমনা থাকিবে বা গোপনে গল্পের বই পড়িবার চেষ্টা করিবে।

উপরের আলোচনা হইতে দেখা যাইতেছে যে, মনের প্রকাশ সাধারণতঃ তিন প্রকারের—চিন্তন (thought, cognition), অনুভূতি (feeling, affection) এবং ক্রিয়া (willing, volition বা conation)। ‘চিন্তন’ পদটি মনোবিজ্ঞান একটু ব্যাপক অর্থে ব্যবহৃত হয়। ‘চিন্তন’ বলিতে সংবেদন (sensation), প্রত্যক্ষ (perception), প্রতিরূপ (image), স্মৃতি (memory), কল্পনা (imagination), ধারণা (conception)

এবং যুক্তি (reasoning) বুঝায় ; অর্থাৎ যাহা কিছু জ্ঞানদান করে তাহাকেই ব্যাপক অর্থে চিন্তন (thought) বা জ্ঞান (cognition) বলে । এইগুলি সবই মনোবিজ্ঞান আলোচ্য বিষয় ।

অনুভূতি আবার সরল (simple) বা জটিল (complex) হইতে পারে । জটিল অনুভূতিকে প্রক্ষোভ বা আবেগ (emotion) বলে । এইগুলি মনোবিজ্ঞান অন্তর্ভুক্ত ।

ক্রিয়া ঐচ্ছিক (voluntary) বা অনৈচ্ছিক (non-voluntary) হইতে পারে । এই ক্রিয়াগুলি সবই মনোবিজ্ঞান বিষয়বস্তু ।

একথা মনে রাখিতে হইতে যে, এই সমস্ত মানসিক প্রকাশগুলি সম্পূর্ণ পৃথক্ বা স্বাধীন থাকে না—ইহার পরস্পরের সহিত অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত থাকে । অবশ্য এক এক সময় একটি বিশেষ অবস্থার প্রাধান্য থাকে । কোন সময় চিন্তনের প্রাধান্য থাকে, কোন সময় অনুভূতির প্রাধান্য থাকে, আবার কোন সময় ক্রিয়ার প্রাধান্য থাকে ।

মানুষের এই বিভিন্ন প্রত্যক্ষ, আবেগ, আশা, আকাঙ্ক্ষা, ইচ্ছা, প্রেরণা সবেমাত্র পশ্চাতে থাকে ‘অহং’-জ্ঞান । দার্শনিক আত্মার স্বরূপ সম্বন্ধে আলোচনা করেন, কিন্তু মনোবিজ্ঞান আত্মার স্বরূপাবস্থার আলোচনার স্থান নাই ; তবে প্রতি মানুষের অন্তরে যে ‘আমিত্ব’-ভাব বা অহং-জ্ঞান আছে (যাহার ফলে সে মনের বিভিন্ন প্রকাশগুলিকে শৃঙ্খলাবদ্ধ বা সুসংবদ্ধ করে), সে সম্বন্ধে মনোবিজ্ঞান আলোচনা করেন । প্রকাশ-ভঙ্গিমার শৃঙ্খলার অভাবেই মানসিক স্বস্থতা নষ্ট হইয়া যায় এবং বিভিন্ন প্রকারের মানসিক রোগ দেখা দেয় । মনোবিজ্ঞান একটি বিশেষ বিভাগ (যাহাকে Abnormal Psychology বা অস্বভাবি-মনোবিজ্ঞান বলা হয়) অস্বস্থ মনের বৈশিষ্ট্য লইয়া আলোচনা করে । (পৃঃ ৭৪-৮১) ।

এই ‘অহং’ (self)-কে কেন্দ্র করিয়া গড়িয়া উঠিয়াছে মানুষের ব্যক্তিত্ব (personality) । ‘ব্যক্তিত্ব’ পদটির সংজ্ঞা দান করা কঠিন ; তবে ব্যক্তিত্ব বলিতে সমগ্র মানুষটিকেই বুঝায়—তাহার বুদ্ধিবৃত্তি, অনুভূতি, কর্মদক্ষতা, ভাব, ধারণা সব কিছুই ব্যক্তিত্বের অন্তর্গত । সুতরাং ব্যক্তিত্বের স্বরূপ, বিভিন্ন স্তরের মধ্য দিয়া উহার প্রকাশ, উহার বিভিন্ন উপাদান ইত্যাদি সমস্তই মনোবিজ্ঞান আলোচ্য বিষয়-বস্তু ।

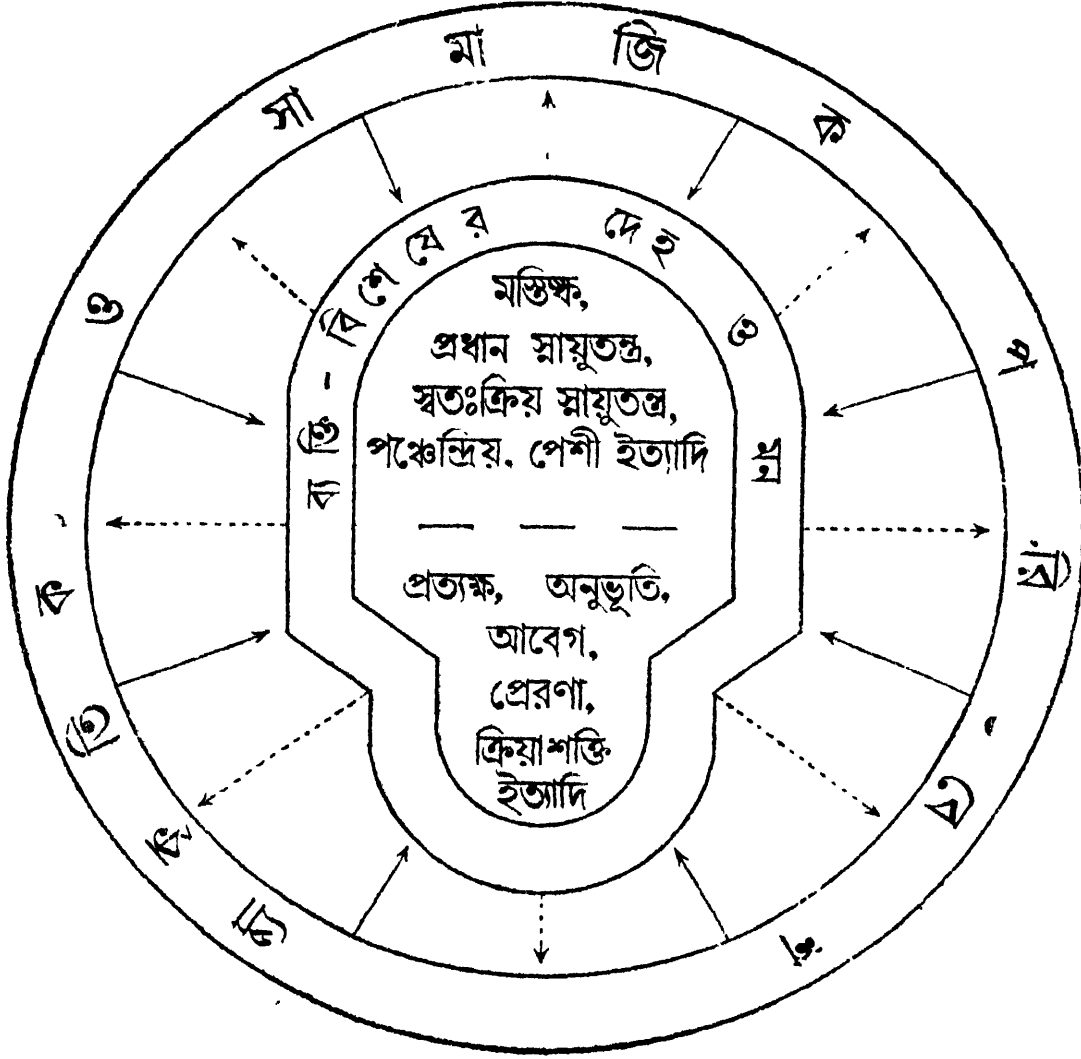
বিভিন্ন মানুষের ব্যক্তিত্ব অর্থাৎ তাহাদের বুদ্ধি, কর্মক্ষমতা, আবেগশীলতা ইত্যাদি অনুধাবন করিলে সহজেই দেখা যায় যে, সকল মানুষের ব্যক্তিত্বের প্রকাশ সমান নহে—কাহারও বুদ্ধি বেশী, কাহারও বা কর্মক্ষমতা বেশী ইত্যাদি; অর্থাৎ ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে যেমন মিল আছে, সেইরূপ পার্থক্যও আছে। এই পার্থক্যগুলিকে বলা হয় **ব্যক্তিগত পার্থক্য** (individual differences)। সুতরাং ব্যক্তিগত পার্থক্যের পরীক্ষা ও পরিমাপও মনোবিজ্ঞা-বিদের কার্যসূচীর অন্তর্গত।

দেহ ও মন পরস্পর পৃথক থাকিতে পারে না। দেহ ও মনের পরস্পরের উপর প্রভাব অপরিমিত। বাহ্যজগৎ সম্বন্ধে মন যে জ্ঞান আহরণ করে, তাহা চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক্ এই পঞ্চেন্দ্রিয়ের মাধ্যমে সম্ভব হয়; আবার এই সমস্ত ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে যে সংবেদন হয়, সেগুলিকে সুসম বা সংগঠিত করিয়া জ্ঞানের অভ্যাদয়ে সহায়তা করে মস্তিষ্ক। আবার মানুষের বিভিন্ন আবেগ বা অনুভূতির, কর্মকুশলতা, বুদ্ধি ইত্যাদি কতকাংশে নির্ভর করে শরীরের অন্তঃস্থিত নালিকাবিহীন গ্রন্থি (ductless or endocrine glands)-এর উপর। এই সমস্ত উদাহরণ ব্যতীত দৈনন্দিন জীবনের অভিজ্ঞতা হইতেই আমরা জানিতে পারি যে, দেহ ও মনের সম্বন্ধ সুনিবিড়—দেহ সুস্থ থাকিলে মন সুস্থ থাকে, আবার মন সুস্থ থাকিলে দেহে ক্ষুধা ভাব জাগে; আবার দৈহিক অসুস্থতা মনের উপর রেখাপাত করে এবং মানসিক অসুস্থতা দেহকে অনেকটা পঙ্গু করিয়া তুলে। সুতরাং মনস্তত্ত্ববিৎ দেহের যে যে অঙ্গ বা অংশ মনের উপর প্রভাব বিস্তার করে (যেমন, পঞ্চেন্দ্রিয়, মস্তিষ্কের বিভিন্ন অংশ, স্নায়ুতন্ত্র ইত্যাদি), সেইগুলি বিশেষভাবে আলোচনা করিবেন।

মনোবিজ্ঞা একটি নবীন বিজ্ঞান এবং বর্তমানে মনোবিজ্ঞার বহু বিভাগ দেখা গিয়াছে। মনোবিজ্ঞার প্রকৃত বিষয়-বস্তু লইয়া মতভেদ আছে এবং বহু ভ্রান্ত ধারণার সৃষ্টি হইয়াছে। অনেকে মনে করেন যে, মনোবিজ্ঞা পাঠ করিলেই অপরের চিন্তা সমীক্ষণ করা যায়, অপরের মনকে সম্মোহিত করা যায় ইত্যাদি।^{১২} সাধারণ মনোবিজ্ঞান এ সমস্ত আলোচনা পরিহার করিয়া চলে এবং অভিজ্ঞতার দৃষ্টিভঙ্গী হইতে মন সম্বন্ধে শুদ্ধ জ্ঞান (theoretical

^{১২} M. R. Harrower, *The psychologist at work*, পৃ: ১-৪ দ্রষ্টব্য।

knowledge) দান করে। অবশ্য এই তাত্ত্বিক জ্ঞানের বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রয়োগ হয় এবং তাহার ফলে মনোবিচার বিভিন্ন শাখা গড়িয়া উঠিয়াছে।



ব্যক্তি ও তাহার পরিবেশের পারস্পরিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া উপরের চিত্রে ইঙ্গিত করা হইয়াছে। ব্যক্তি-বিশেষকে মনোবিজ্ঞান এই পরিপ্রেক্ষিতে আলোচনা করে।

সংযোজন :

(ক) ব্যবহারের ব্যাখ্যা-সূত্র :

আমরা উপরে বলিয়াছি যে, বাহ্য পরিবেশ মানুষের মনের উপর সর্বদা প্রভাব বিস্তার করিতেছে এবং মানুষও নিজেকে তাহার পারিপার্শ্বিক অবস্থার সহিত মানাইয়া লইবার জন্য নানাপ্রকার কার্য করিতেছে।

মানুষের মনের এই প্রতিক্রিয়াকে বুঝাইবার জন্য অধ্যাপক উড্‌ওয়ার্থ যে সাংকেতিক-সূত্র (symbolic formula) দিয়াছেন তাহাই আমরা এখানে ব্যাখ্যা করিব।

বাহ্যজগৎ মানুষের উপর ক্রিয়া করিতেছে এবং তাহারই প্রভাবে জগতের উপর মানুষ প্রতিক্রিয়া করিতেছে। যেমন, শীতের আবির্ভাবে যখন আমরা ঠাণ্ডা বোধ করিলাম, তখন আমরা গরম জামা ব্যবহার করিলাম। আবার গ্রীষ্মের আবির্ভাবে আমরা ঐ প্রকার জামার ব্যবহার ত্যাগ করিলাম। সুতরাং বাহ্য পরিবেশ (environment বা world) দেহধারী জীব (organism)-এর মনের উপর প্রভাব বিস্তার করে এবং তাহারই ফলে বিভিন্ন প্রকার প্রতিযোজক প্রতিক্রিয়া (adaptive reaction) দেখা দেয়। ইহাকে সংক্ষেপে সাংকেতিক ভাষায় বলা যায় :

$$W \rightarrow O \rightarrow W \quad \text{বা} \quad জ \rightarrow দে \rightarrow জ$$

('W' বা 'জ' অর্থে world, জগৎ বা বাহ্য পরিবেশ ; 'O' বা 'দে' অর্থে organism বা দেহ)।

বাহ্য জগতের যে প্রভাব আমাদের মনের উপর কার্য করে, তাহাকে বলে উদ্দীপক (stimulus) এবং তাহার ফলে আমাদের মন যে-ভাবে উহার উপর কার্য করে, তাহাকে বলে প্রতিক্রিয়া (reaction)।

এই প্রতিক্রিয়ার জন্য প্রয়োজন হয় প্রস্তুতি (preparation বা set) ; বিভিন্ন প্রকার প্রতিক্রিয়ার জন্য দেহমধ্যে পূর্ব হইতেই প্রস্তুতি থাকে। এই সব বিভিন্ন প্রতিক্রিয়ার দ্বারা কি উদ্দেশ্য সাধিত হয় ? পূর্বেই বলা হইয়াছে, ইহা দ্বারা বাহ্য জগতের সহিত দেহ-মনকে মানাইয়া লওয়ার চেষ্টা হয়, অর্থাৎ 'প্রতিক্রিয়া' হইল 'প্রতিযোজক ক্রিয়া'।

ব্যক্তি-বিশেষকে কেন্দ্র করিয়া যদি তাহার ব্যবহারকে সাংকেতিক ভাষায় বর্ণনা করিতে হয়, তাহা হইলে বলিতে হইবে :

$$S \rightarrow R \quad \text{বা} \quad উ \rightarrow প্র$$

('S' বা 'উ' অর্থে stimulus বা উদ্দীপক এবং 'R' বা 'প্র' অর্থে reaction বা প্রতিক্রিয়া)।

ব্যক্তি বিশেষের উপর উদ্দীপক কার্য করিল এবং সে তাহারই ফলে প্রতিক্রিয়া করিল।

যদি প্রশ্ন উঠে : ‘এই উদ্দীপক কোথা হইতে আসিল?’, তাহা হইলে বলিতে হইবে ‘বাহ্য জগৎ হইতে’ অর্থাৎ $W \rightarrow S$ বা $জ \rightarrow উ$ । এই উদ্দীপক দেহ-মনোবিশিষ্ট জীবের উপর কার্য করিল। ঐ দেহ আবার অবস্থানুযায়ী প্রতিযোজক ক্রিয়া করিবার জন্ত প্রস্তুত থাকে। ইহাকে বুঝাইবার জন্ত OW বা দে-জ সংকেত ব্যবহার করা হয়; ইহার অর্থ হইল ‘organism’ ready for adaptation to the ‘world’, অর্থাৎ যে দেহ বাহ্য জগতের উপযুক্ত প্রতিযোজক ক্রিয়া করিবার জন্ত প্রস্তুত। অবশ্য সকল ক্ষেত্রেই যে ব্যক্তি-বিশেষ প্রস্তুত থাকে বা প্রস্তুত থাকিলেও উপযুক্ত ক্রিয়া করিতে সমর্থ হয়, তাহা নহে। যাহা হউক, দেহ-মনের যদি ‘প্রস্তুতি’ থাকে, তাহা হইলে বলিতে পারি :

$$W \rightarrow S \rightarrow OW \rightarrow R \rightarrow W$$

$$বা জ \rightarrow উ \rightarrow দে-জ \rightarrow প্র \rightarrow জ।$$

মোট কথা, দেহ ও মন উদ্দীপকের ফলে প্রতিক্রিয়া করে, এবং তাহার ফলে আবার বাহ্য জগতে কোন-না-কোন পরিবর্তন সাধিত হয়।

(খ) চিন্তন, অনুভূতি ও ক্রিয়ার পারস্পরিক সম্বন্ধ :

চিন্তন, অনুভূতি ও ক্রিয়ার মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতা যেমন আছে, সেইরূপ ইহাদের মধ্যে বৈপরীত্যও আছে।

ইহাদের মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতা আছে, কারণ একটি অপরটি ব্যতীত থাকিতে পারে না। মনের এমন কোন অবস্থা থাকিতে পারে না যেখানে কেবলমাত্র চিন্তন আছে, বা কেবলমাত্র অনুভূতি আছে বা কেবলমাত্র ইচ্ছা আছে। চিন্তন থাকিলেই কিছু-না-কিছু অনুভূতি ও ইচ্ছা থাকিবে, অনুভূতি থাকিলেই অল্পবিস্তর চিন্তন ও ইচ্ছা তাহার সহিত জড়িত থাকিবে; আবার ইচ্ছা থাকিলেই তাহার সহিত সংযুক্ত থাকিবে চিন্তন ও অনুভূতি। আমরা পূর্বেই (পৃ: ৬, ৭) উদাহরণ দিয়াছি কিরূপে চিন্তা হইতে অনুভূতি ও ইচ্ছা জাগরিত হয়। এইদিক হইতে দেখিলে চিন্তন

অনুভূতি ও ইচ্ছা ইহাদের পরস্পরের মধ্যে অন্তোন্ত-আশ্রয়বৃত্তি এবং অন্তোন্ত-জননবৃত্তি আছে।

আবার উহাদের মধ্যে পারস্পরিক বৈপরীত্যও আছে। উহাদের মধ্যে একটির আধিক্য ঘটিলে অন্য দুইটির প্রভাব অনেকাংশে কমিয়া যায়। যদি চিন্তন বাড়ে, তাহা হইলে অনুভূতি ও ইচ্ছার আধিক্য থাকে না। অতিরিক্ত চিন্তাশীল ব্যক্তির কর্মপটুতা থাকে না (বা *thought paralyses action*)—ইহা আমরা অনেক ক্ষেত্রে দেখিতে পাই। আবার যাহারা অত্যন্ত অনুভূতি-প্রবণ তাহাদের অধিক চিন্তন-শক্তি থাকে না। সেইরূপ যাহাদের আবেগ ও ইচ্ছা-শক্তি অত্যন্ত প্রবল তাহারা অনেক সময় হঠকারী হয়—তাহাদের যুক্তিসম্মত উপায়ে চিন্তা করিবার বা সূক্ষ্ম অনুভূতি বোধ করিবার ক্ষমতা বিশেষ থাকে না। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে চিন্তন, অনুভূতি ও ইচ্ছা, এই তিনটির মধ্যে একের অগ্রকে অভিভূত করিবার ক্ষমতা আছে, অর্থাৎ ইহাদের অন্তোন্ত-অভিভববৃত্তি আছে।

ইহাদের পরস্পরকে তুলনা করিলে দেখা যাইবে যে, অনুভূতি প্রধানতঃ ব্যক্তিগত ব্যাপার, বাস্তবচিন্তা অনেকাংশে নৈর্ব্যক্তিক ও বস্তুমুখী এবং ইচ্ছার ব্যক্তিগত ও নৈর্ব্যক্তিক উপাদান দুইই আছে। আবার ইহাও বলা হয় যে, অনুভূতি সর্বাধিক নিষ্ক্রিয়, ইচ্ছা সর্বাধিক সক্রিয় এবং চিন্তনের মধ্যে নিষ্ক্রিয়তা ও সক্রিয়তা দুই-ই আছে।^{১৩}

৩। মনোবিজ্ঞানের সংজ্ঞা (Definition of Psychology) :

পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, বিজ্ঞান হিসাবে মনোবিজ্ঞান বা মনস্তত্ত্ব নিতান্তই তরুণ এবং মনস্তাত্ত্বিকদের মধ্যে মনোবিজ্ঞানের প্রকৃত সংজ্ঞা লইয়া যথেষ্ট মতভেদ আছে। তবে এই প্রকার মতবিরোধ দেখিয়া হতাশ হইবার বা মনোবিজ্ঞানকে ব্যঙ্গ করিবার কোন কারণ নাই। সকল বিজ্ঞানের আদিতেই অনেক মতভেদ, অনেক স্কুলধারণা থাকে, কালক্রমে ঐ সমস্ত মত বা

১৩ ইংরাজীতে বলা হয় : “Feeling is subjective, Thought is objective and Will is both”; আবার, “Feeling is supremely passive, Will is supremely active and Thought both.”

ধারণাগুলি পরিবর্তিত, পরিমার্জিত ও পরিশোধিত হয়। মনোবিজ্ঞান সম্বন্ধেও এইরূপ আশা পোষণ করিতে হইবে।^{১৪}

আমরা এখানে প্রথমে কয়েকটি প্রচলিত সংজ্ঞার আলোচনা করিব।

(ক) প্রাচীনকালে মনোবিজ্ঞান দর্শনের অঙ্গ হিসাবেই পরিগণিত হইত এবং মনোবিজ্ঞানের অর্থ ছিল **আত্মা-সম্বন্ধীয় আলোচনা (science of soul)**। আধুনিককালের বিজ্ঞান বাহ্য অভিজ্ঞতার উপর গড়িয়া উঠিয়াছে; কিন্তু প্রাচীন মনোবিজ্ঞান বাহ্য অভিজ্ঞতার উপর গুরুত্ব আরোপ না করিয়া আত্মা সম্বন্ধীয় তাত্ত্বিক আলোচনায় ব্যাপৃত থাকিত। মনোবিজ্ঞানের ইংরাজী প্রতিশব্দ Psychology এবং উহা 'Psyche' ও 'Logos' এই দুই পদের সমন্বয়। 'Psyche' বলিতে বুঝায় 'Soul' বা আত্মা এবং 'Logos' অর্থে বিজ্ঞান। সুতরাং ব্যাপ্তিগত অর্থে psychology বলিতে বুঝায় science of soul বা আত্মাসম্বন্ধীয় বিজ্ঞান।

আধুনিককালের মনোবিদগণ মনোবিজ্ঞান এই সংজ্ঞা পরিহার করিয়াছেন। তাঁহারা মনোবিজ্ঞানকে দর্শনের অধীন বা অন্তর্গত বলিয়া মনে করেন না। তাঁহারা বলেন, আত্মার প্রকৃত স্বরূপ কি এবং উহার ভাবী পরিণতি কি হইতে পারে, তাহা তত্ত্বসম্বন্ধীয় আলোচনা এবং উহা তত্ত্ববিজ্ঞান (Metaphysics) ও দর্শন (Philosophy)-এর বিষয়বস্তু। মনের যে সমস্ত বাহ্যপ্রকাশ দৈনন্দিন জীবনের অভিজ্ঞতায় জানা যাইতে পারে এবং মনের নিষ্কর্ষন বা অবচেতন

১৪ বিখ্যাত দার্শনিক ও মনোবিৎ উইলিয়াম জেম্সের ভাষায় "Psychology is not a science, but the hope of a science."

একদিন ছিল যখন বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে রসায়নশাস্ত্র (Chemistry)-এর বিশেষ কোন পৃথক স্থান ছিল না এবং উহা alchemy বলিয়া পরিগণিত হইত। বিভিন্ন প্রকার প্রাণবিজ্ঞান ও দেহবিজ্ঞান (biological and psychological sciences)-এরও আদিতে তাঁহাদের আলোচ্য বিষয়-বস্তু সম্বন্ধে যথেষ্ট মতবিরোধ ছিল।

O. L. Zangwill-এর কথাগুলি শ্রীমানযোগ্য : "To the eye of an unsympathetic critic, contemporary psychology might well appear as an ill-defined sphere of inquiry, lacking a clear-cut frame of reference.....At the same time, it must be borne in mind that similar criticisms could be made of every biological science in the formative period of its development.....yet from the crude and animistic speculations of early medicine has arisen the highly refined modern science of experimental physiology. Is it too much to hope that psychology will achieve an equally distinguished position... ?" (An Introduction to Modern Psychology, pp. 1, 2).

স্তরে থাকিয়া দৈনন্দিন জীবনের উপর যে সব ধারণা ও বাসনা প্রভাব বিস্তার করে, বিজ্ঞান হিসাবে মনোবিজ্ঞান সেইগুলি আলোচনা করে—কোন অতীন্দ্রিয় সত্তা তাহার বিষয়-বস্তু নহে। তাহা ছাড়া, দার্শনিকদের নিজেদের মধ্যেই আত্মা সম্বন্ধে যথেষ্ট মতভেদ আছে এবং অনেকে আত্মাকে অস্বীকার করিয়াছেন। সুতরাং মনোবিজ্ঞান হইতে আত্মার আলোচনা পরিত্যাগ করাই উচিত।^{১৫}

(খ) আধুনিক যুগের প্রারম্ভে মনোবিজ্ঞানকে **মনঃ-সম্বন্ধীয় বিজ্ঞান** (*science of mind*) আখ্যা দেওয়া হইত।

এই সংজ্ঞাও সকল মনোবিৎ গ্রহণ করেন না। ‘আত্মা’ পদটি লইয়া যেমন বহু বিতর্ক দেখা দিয়াছে, সেইরূপ ‘মন’ পদটি লইয়াও কিছু কিছু মতবিরোধ আছে। তাহা ছাড়া ‘মন’ বলিয়া কোন সত্তা অস্ত্রের ক্ষেত্রে সরাসরি জানা যায় না—‘মন’ অপেক্ষা মনের প্রকাশই আমাদের অভিজ্ঞতার বিষয়-বস্তু। আবার মনোবিজ্ঞানকে যদি কেবলমাত্র মনঃ-সম্বন্ধীয় বিজ্ঞান (*mental science*) বলিয়া বর্ণনা করা হয়, তাহা হইলে যুক্তিশাস্ত্র (*logic*), নীতিশাস্ত্র (*ethics*) ইত্যাদি মনঃ-সম্বন্ধীয় বিজ্ঞান হইতে ইহার পার্থক্য স্পষ্ট করিয়া নির্দেশ করা হইল না।

(গ) কেহ কেহ মনোবিজ্ঞানের সংজ্ঞা দিয়াছেন যে, ইহা **চেতনা-সম্বন্ধীয় বিজ্ঞান** (*science of consciousness*); ইহারা মনে করেন, চেতনাই মনের সারধর্ম।^{১৬}

এই সংজ্ঞার বিরুদ্ধে প্রধান আপত্তি হইল যে, ইহা মন ও চেতনাকে কতকটা তুল্যার্থবোধক করিয়াছে; কিন্তু কেবলমাত্র চেতনাকে লইয়া মন নহে—আধুনিক মনোবিদগণের মতে মনের মধ্যে একটা চেতনাতিরিক্ত স্তর আছে, উহাকে বলা হয় নিজ্ঞান স্তর (*unconscious level*) এবং মনের চেতনাময় অবস্থার বহু ধারণা, ইচ্ছা ইত্যাদি নিজ্ঞান স্তরদ্বারা প্রভাবিত হয়।

১৫ প্রাচীন যুগের এই মনোবিজ্ঞানকে অনেক সময় *Rational Psychology* বলা হয়, কারণ প্রাচীনপন্থীরা *reason* বা যুক্তিকেই আত্মার সারাংশ (*essence of soul*) মনে করিতেন। আধুনিকপন্থীরা মনোবিজ্ঞানকে অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে গাড়িয়া তুলিয়াছেন—এইজন্য ইহাকে *Empirical Psychology* বলা হয়।

১৬ দার্শনিক দ্ব্যকাত বলিয়াছেন, চেতন মনের সারধর্ম এবং বিস্তার জড়ের সারধর্ম।

সুতরাং যে সংজ্ঞা মনের এক বিরাট অংশকে বাদ দিয়া থাকে, তাহা আমাদের গ্রহণযোগ্য হইতে পারে না। আবার যাহারা মনোবিজ্ঞাকে কেবলমাত্র চেতনার বিজ্ঞান বলিয়া মনে করেন, তাঁহারা চেতনার বিশ্লেষণ করিয়াই তাঁহাদের কার্য সমাপ্ত মনে করেন, কিন্তু ইহা দ্বারা বাহ্য জগতের সহিত মানব মনের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার কারণ কি বা উদ্দেশ্য কি, তাহা নিরূপিত হয় না।

(ঘ) অতি-আধুনিক মনোবিদগণ মনে করেন যে, মানুষের মনের প্রকাশ মানুষের কার্যের বা ব্যবহারের মাধ্যমে; সেইজন্য মনোবিজ্ঞাকে আজকাল ব্যবহার-সম্বন্ধীয় বিজ্ঞান (*science of behaviour*) বলা হয়।

‘ব্যবহার’ পদটি লইয়া মনোবিদগণের মধ্যে যথেষ্ট মতভেদ আছে। মানুষের ক্রিয়াকে দুই ভাবে ব্যাখ্যা করা যায়—যান্ত্রিকতাবাদের দৃষ্টিভঙ্গী (*mechanical standpoint*) হইতে এবং অভিপ্রায়বাদ বা উদ্দেশ্য-সাধনবাদের দৃষ্টিভঙ্গী (*purposive* বা *teleological standpoint*) হইতে। প্রথমোক্ত দৃষ্টিভঙ্গী গ্রহণ করিয়াছেন জে. বি. ওয়াটসন্ (J. B. Watson) ইত্যাদি যান্ত্রিকতাবাদী মনোবিদগণ। ওয়াটসন্ মানুষের বাহ্য ক্রিয়ার অন্তরালে ‘মন’ বলিয়া কোন পদার্থের অস্তিত্ব স্বীকার করেন না—বিদ্যুৎচালিত পাখা যেমন বিদ্যুতের সঞ্চার হইলেই ঘুরিতে থাকে, বাষ্পযান যেমন বাষ্পের প্রভাবে চলিতে থাকে, সেইরূপ বাহ্যজগতের বিভিন্ন বস্তুর সংস্পর্শে আমরা (অর্থাৎ দেহধারী জীবেরা, ‘মনঃ’-বিশিষ্ট জীব নহে) প্রতিক্রিয়া করি। ‘উদ্দীপক→প্রতিক্রিয়া’ (*Stimulus→Response*, সংক্ষেপে *S→R*) এই সূত্রের সাহায্যে মানুষের সকল কার্যের ব্যাখ্যা করা যায়। (পৃঃ ৯৮)। এইজন্য ইহারা মনোবিজ্ঞান ইতিহাসে ব্যবহারবাদী বা চেষ্টিতবাদী (*Behaviorist*) নামে পরিচিত। ‘ব্যবহার’-পদটির এইরূপ ব্যাখ্যা করিলে মানুষকে দেহ-বিশিষ্ট যন্ত্রে রূপান্তরিত করা হয় এবং মনোবিজ্ঞা তখন শারীরবিজ্ঞা (*Physiology*)-তে পর্যবসিত হয়।

সুতরাং মনোবিজ্ঞাকে যদি ব্যবহার-বিজ্ঞান বলিয়া বর্ণনা করিতে হয়, তাহা হইলে ‘ব্যবহার’-পদটিকে উপযুক্ত যান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গী হইতে ব্যাখ্যা দেওয়া যাইবে না; উহাকে কোন উদ্দেশ্যসাধন-প্রয়াসী মনের প্রকাশ বলিয়া দেখিতে হইবে। বাস্তবিক ‘ব্যবহার’ পদটিকে এই অর্থে গ্রহণ করিয়া উইলিয়াম ম্যাকডুগাল (*William McDougall*) আধুনিককালে মনোবিজ্ঞান সংজ্ঞা

‘ব্যবহার-বিজ্ঞান’ (science of human conduct or behaviour) দিয়াছেন।^{১৭} পরে ওয়াটসন্ ম্যাকডুগালের এই সংজ্ঞা গ্রহণ করেন এবং ফলে ‘ব্যবহার’-পদটির অপব্যাপ্যার সৃষ্টি হয়।^{১৮}

ম্যাকডুগালের এই সংজ্ঞার বিশেষ গুণ হইল যে, ইহা মনের যে সকল প্রকাশ অত্নের নিকট সুপরিষ্কৃত, অর্থাৎ বাহ্যক্রিয়াবলী, তাহাকেই মনোবিজ্ঞান প্রধান আলোচ্য বিষয় বলিয়া নির্দেশ দিয়াছে এবং ইহা আত্মা, মন, চৈতন্য ইত্যাদি বিতর্কমূলক বা দ্ব্যর্থমূলক পদ পরিত্যাগ করিয়াছে। তাহা ছাড়া, বাহ্যক্রিয়া বা ব্যবহার সাধারণ অর্থে গ্রহণ করিলে মন এবং চেতনার কথা তাহার সহিত জড়িত থাকে, কিন্তু চেতনা বা মনের ব্যাখ্যা করিবার জন্য ব্যবহারের কথা নাও উঠিতে পারে।^{১৯}

১৭ McDougall-রচিত *Primer of Physiological Psychology* (1905) এবং *Psychology, the study of Behavior* (1912) দ্রষ্টব্য।

১৮ ম্যাকডুগাল তাঁহার ব্যবহৃত এই সংজ্ঞা সম্বন্ধে তাঁহার *Outline of Psychology* (১৯২৩ সালে প্রথম প্রকাশিত) গ্রন্থে মন্তব্য করিয়াছেন :

“I still regard this definition as a good one, logically perhaps the best. But since my suggestion was made, it has been adopted and carried to an extreme by the ‘behaviorists’. In protesting against a too exclusive study of the introspective data, and rightly insisting on the importance of the study of behavior as a psychological method, they have overshot the mark... Hence I am disposed to say, ‘If you are going to get on, it’s time for me to get off.’” তাহার পর তিনি সাধারণভাবে বলিয়াছেন : “This question of the definition of psychology is after all one of minor importance. All our lines of separation between the sciences are provisional only and liable to readjustment as knowledge grows. We ought to aim not so much at perfectly logical definitions, which will only be possible when the sciences are completed, but at definitions stated in terms of the practical purposes with which we pursue the several sciences. Accepting this principle, we may define physiology, as it exists to-day, as the science which aims to give us better understanding and control of the chemical and physical processes of the various organs of the body ; and psychology as the science which aims to give us better understanding and control of the behaviour of the organism as a whole.” (*Outline of Psychology*, 5th Ed., p. 38 fn.)

১৯ “...if we start with behaviour it is easier to find a place for consciousness and mind than it is to find a place for behaviour if we start with mind or consciousness.” (K. Koffka, *Principles of Gestalt Psychology*, p. 25).

ওয়াটসন্ ও ম্যাকডুগালের দৃষ্টিভঙ্গীর পার্থক্য বুঝিবার জন্য একটি উদাহরণ লওয়া যাউক।^{২০} যখন একটি মোটরগাড়ী ছুটিতে থাকে, তখন বাহির হইতে আমরা যে গতি দেখি, তাহা ঐ বস্তুর সামগ্রিক গতি; কিন্তু ঐ গতি সম্ভব হয় উহার জালানী পেট্রলের জন্ম, অর্থাৎ পেট্রলের অণুগুলির মধ্যে সংঘাতের বা গতির সৃষ্টি হয় বলিয়া। এই গতি হইল আণবিক গতি। এখন যদি গাড়ীটির গতিকে ব্যাখ্যা করিতে হয়, তাহা হইলে চালক উহাকে যে লক্ষ্যের পথে লইয়া যাইতেছে, সেই লক্ষ্যের দৃষ্টিভঙ্গী হইতে ঐ গতিকে ব্যাখ্যা করা যাইতে পারে। অথবা, পেট্রোলরূপ জালানী কার্য করার ফলে গাড়ীর অভ্যন্তরীণ যন্ত্রের কিরূপ পরিবর্তন সাধিত হইতেছে, কেবলমাত্র তাহা বর্ণনা করিয়া ঐ গতিকে ব্যাখ্যা করা যাইতে পারে। সেইরূপ মানুষের ব্যবহার বা কার্য ব্যাখ্যা করিবার কালে আমরা ঐ কার্যের উদ্দেশ্য বা লক্ষ্যের সাহায্যে উহাকে ব্যাখ্যা করিতে পারি, অথবা কেবলমাত্র দেহ-যন্ত্রের পরিবর্তন হিসাবে উহাকে বর্ণনা করিতে পারি। এইবার মানুষের কোন কার্যের উদাহরণ লওয়া যাউক। মনে করা যাউক, ছাত্রেরা ক্লাসে ঢুকিয়া মনোযোগ সহকারে শিক্ষকের বক্তৃতা শুনিতোছে। ম্যাকডুগ্যাল যখন ছাত্রদের এই কার্য ব্যাখ্যা করিবেন, তখন তিনি ছাত্রদের বাহ্য কার্যাবলীকে (যাহা আমরা সকলেই প্রত্যক্ষ করিতে পারি) মনঃ-সজ্জাত বলিয়া বর্ণনা করিবেন; যেমন, তাহারা এক বিশেষ উদ্দেশ্য প্রণোদিত হইয়া বিশেষ ভঙ্গিমা লইয়া বক্তৃতা শুনিতোছে এবং তাহার অর্থ হৃদয়ঙ্গম করিতেছে। ওয়াটসন্ যখন ব্যাখ্যা করিবেন, তখন তিনি বলিবেন, শিক্ষকের বক্তৃতা ছাত্রদের নিকট এক বিশেষ উদ্দীপক,—ঐ উদ্দীপকের ফলে কর্ণ হইতে মস্তিষ্কের স্নায়ুতন্ত্রে পরিবর্তন আসিল, আবার অগ্র কতকগুলি স্নায়ুতন্ত্রের মাধ্যমে মস্তিষ্ক হইতে দেহের বিভিন্ন পেশীতে শক্তিসঞ্চার হইল এবং ছাত্রেরা এক বিশেষ ভঙ্গিমা বসিল।

মনোবিজ্ঞান দৃষ্টিভঙ্গী হইতে আমরা ওয়াটসনের ব্যাখ্যায় সন্তুষ্ট থাকিতে পারি না, কারণ ইহা মনকে অস্বীকার করিয়া মানুষকে দেহবিশিষ্ট-যন্ত্রে রূপান্তরিত করিয়াছে। মানসিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার সহিত যে দৈহিক

২০. Koffka, *Principles*, পৃ: ২৫—২৭ দ্রষ্টব্য। কফ্কা ও টোলমান (Tolman) এই প্রশ্নে পদার্থবিজ্ঞান হইতে molar ও molecular motion-এর পার্থক্যের উপমা দিয়াছেন।

পরিবর্তন থাকে না, তাহা আমরা বলিতেছি না—আমাদের মত হইল যে, কেবলমাত্র দেহযন্ত্রের নামে মানসিক ক্রিয়ার ব্যাখ্যা করিলে উহা এক-দেশদর্শী ও অসম্পূর্ণ থাকিবে। মনোবিজ্ঞান ব্যাখ্যা হইবে মনকে কেন্দ্র করিয়া—দেহকে কেন্দ্র করিয়া নহে। আমরা যখন মনোবিজ্ঞান ‘ব্যবহার’-পদটি গ্রহণ করি, তখন বুঝি মনের ব্যবহার বা ক্রিয়া—মন যখন পরিবেশের সংস্পর্শে আসে তখন, অর্থাৎ মন ও পরিবেশ এই দুইয়ের ঘাত-প্রতিঘাতে, এই ক্রিয়া সজ্ঞাত হয়। এই ক্রিয়ার পশ্চাতে থাকে মনের সংযোগ অথবা প্রভাব; অর্থাৎ মন ইহার অর্থ বুঝে, ইহার মাধ্যমে কোন উদ্দেশ্য সাধনের চেষ্টা করে এবং উদ্দেশ্য সাধিত হইলে ঐ ক্রিয়া সমাপ্ত হয়; আবার মন অনেকক্ষেত্রে প্রয়োজনমত ইহার পরিবর্তন ও উন্নতিসাধনও করিতে পারে।^{২১}

(ঙ) উপসংহার :

এখন প্রশ্ন উঠিতে পারে : এই সমস্ত বিভিন্ন সংজ্ঞাগুলির মধ্যে কোনটি গ্রহণযোগ্য? উত্তরে বলিতে পারা যায় যে, কোন সংজ্ঞাই সম্পূর্ণ ভুল নহে। এক একটি সংজ্ঞায় এক একটি বিষয়ের উপর গুরুত্ব আরোপ করা হইয়াছে। যদি আমরা মনের বিভিন্ন পরিবর্তনের পশ্চাতে অন্ততঃ আপেক্ষিকভাবে কোন স্থায়ী সত্তা (তাহা দার্শনিকের আত্মা হউক বা না হউক) কল্পনা না করি, তাহা হইলে স্বস্থ মনের বিভিন্ন প্রকাশগুলির সংগঠন ও শৃঙ্খলা বুঝাইতে পারি না (পৃঃ ২৭৫)। সুতরাং মনোবিজ্ঞান মনঃ-সম্বন্ধীয় বিজ্ঞান (science of self or mind)। আবার আমাদের মানসিক জীবনে চেতন ও নিজ্ঞান স্তর উভয়ের অবদান থাকিলেও, মনের যে অংশকে আমরা জানিতে পারি তাহা চেতনাময় অংশ; যখন আমাদের চিন্তা, অনুভূতি বা ইচ্ছা বাহ্যতঃ প্রকাশ পায়, তখন আমরা সে সম্বন্ধে সচেতন হই এবং অনেকক্ষেত্রে এইসব চিন্তা ইত্যাদি নিয়ন্ত্রণ করিতে পারি। এই দিক হইতে বিচার করিলে মনোবিজ্ঞান ‘চেতনার বিজ্ঞান’ বা ‘অভিজ্ঞতার বিজ্ঞান’ (science of consciousness or experience) এই সংজ্ঞারও যৌক্তিকতা আছে।

তবে বর্তমানকালে অধিকাংশ মনোবিৎ ওয়াটসনীয় যান্ত্রিকতাবাদ সমর্থন না করিলেও ব্যবহারের উপরই বিশেষ প্রাধান্য আরোপ করিয়াছেন;

২১ মানসিক ব্যবহার ও যান্ত্রিক ব্যবহারের পার্থক্য বুঝিবার জন্য McDougall, *Outline*, ২য় অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

সেইজন্য তাঁহারা মনোবিজ্ঞানকে ‘ব্যবহারের বা বাহ্য ক্রিয়ার বিজ্ঞান’ (science of behaviour) বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন।^{২২} বর্তমানকালের মনোবিদগণ মনে করেন যে, বিজ্ঞান হিসাবে মনোবিজ্ঞান আলোচ্য বিষয় কোন ‘ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য বাস্তব ঘটনা’ হওয়া উচিত; যেহেতু ব্যবহারের মাধ্যমে মনের যে প্রকাশ ঘটে, তাহা সকলের নিকট সমানভাবে প্রকাশমান, সেইহেতু ইহা লইয়া আলোচনা করিলে বাস্তব ঘটনা (real fact) লইয়াই আলোচনা করা হইবে।

পরিশেষে আমাদের মস্তব্য এই যে, মনোবিজ্ঞান সর্বজনগ্রাহ্য একটি সংজ্ঞা দান করা কঠিন। এই প্রসঙ্গে ইহাও মনে রাখিতে হইবে যে, বিভিন্ন পুরাতন

২২ আমরা উদাহরণস্বরূপ কয়েকজন আধুনিক লেখক প্রদত্ত সংজ্ঞার উল্লেখ করিতেছি—
ইহারা সকলেই ‘ব্যবহার’ বা ‘ক্রিয়া’ পদটির প্রয়োগ সমর্থন করিতেছেন :

(১) R. S. Woodworth : “Psychology undertakes to make a scientific study of the *activities* of the individual considered as a unit, as he really is in his dealings with other individuals, and with the world.” (*Psychology*, 12th. Ed., p. 19).

(২) K. Koffka : “It (Psychology) is the study of *behaviour* in its causal connection with the psycho-physical field”. (*Principles of Gestalt Psychology*, p. 67.)

(৩) N. L. Munn : “When Psychology is defined as the scientific investigation of behaviour, (it) is as good a definition as any.” “Psychology thus studies certain functions of organism, as these are *objectified* through instruments or language or other forms of *behaviour*.” (*Psychology : The fundamentals of human adjustment*, p. 16).

(৪) O. L. Zangwill : “Psychology has been aptly defined as the study of the general *activity* and *behaviour* of organisms in their relations with the environment.” (*An Introduction to Modern Psychology*, p. 12).

(৫) Boring, Langfeld & Weld : “Psychology deals with both the *behaviour* of men as it appears in his responses and with consciousness as he finds it in his immediate experience.” (*Foundations of Psychology*, p. 4),

(৬) C. T. Morgan : “Psychology is the study of behaviour”. (*Introduction to Psychology*, p. 9).

(৭) Stagner and Karwoski : “Operationally...we can define Psychology as the study of human *behaviour* and *experience*.” (*Psychology*, p. 20).

(৮) Wenger, Jones & Jones : “Psychology is usually defined today as the science of the *behaviour* of organisms. In other words, it involves a study of what organisms do, whether it be thinking, remembering, or moving.” (*Physiological Psychology*, p. 1).

সংজ্ঞার মধ্যে কিছু-না-কিছু সত্য নিহিত আছে, তাহা না হইলে পুরাতন সংজ্ঞার ভিত্তিতে আজিকার বিজ্ঞান গড়িয়া উঠিতে পারিত না।^{২৩}

তবে বর্তমান ক্ষেত্রে আমরা মনোবিজ্ঞান আধুনিক সংজ্ঞা গ্রহণ করিলাম। মনোবিজ্ঞান এই আধুনিক সংজ্ঞা হইল মনোবিজ্ঞান কোন মনোবিশিষ্ট জীবের ব্যবহার-সম্বন্ধীয় বস্তু-নিষ্ঠ বিজ্ঞান। নিম্নলিখিত কয়েকটি সত্তে ইহা গ্রহণযোগ্য : (১) ব্যবহার বা ক্রিয়া সন্ধীর্ণ অর্থে বুঝিলে চলিবে না। ব্যবহার বা ক্রিয়া বলিতে আমরা যেমন চলাফেরা, খেলাধুলা ইত্যাদি বুঝিব, সেইরূপ চিন্তা করা, আবেগ বা অনুভূতিবোধ করাও বুঝিব। (২) এই ব্যবহারের পশ্চাতে ‘মন’ আছে এবং ব্যবহার ঐ মনেরই কোন-না-কোন অবস্থার বাহ্য প্রকাশ অর্থাৎ উহা মনঃসজ্জাত। (৩) এই বাহ্য প্রকাশের সহিত ব্যক্তি বা জীবের অভিজ্ঞতা বর্তমান থাকিবে। (৪) ব্যবহার বা ক্রিয়ারূপে জীবের মনের প্রকাশ যখন ঘটে, তখন বুঝিতে হইবে জীব ও তাহার পরিবেশের মিথস্ক্রিয়া (interaction)-এর ফলেই উহার উদ্ভব হইয়াছে। জগতে কোন জীবেরই সম্পূর্ণ পৃথক্ অস্তিত্ব নাই—জীব ও তাহার পরিবেশ লইয়াই তাহার সমগ্রত্ব। (৫) এই ব্যবহারকে যদিও কেবলমাত্র দেহ-যন্ত্রের ব্যবহার বলিয়া বর্ণনা করা সমীচীন হইবে না, তথাপি উহার সহিত দেহ-যন্ত্রের পরিবর্তন সংশ্লিষ্ট থাকে।

৪। বিজ্ঞান হিসাবে মনোবিজ্ঞান বৈশিষ্ট্য (Nature of Psychology as a science) :

আমরা পূর্বেই বলিয়াছি প্রকৃতির কোন বিশেষ অংশ লইয়া স্বশৃঙ্খল আলোচনার নাম বিজ্ঞান (১ম অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য)। প্রকৃতিকে আমরা সুবিধার জন্য তিন ভাগে ভাগ করিয়া থাকি—অচেতন জড়, প্রাণ ও চেতনা বিশিষ্ট মন (matter, life and mind)। কতকগুলি বিজ্ঞান জড় প্রকৃতির আলোচনা করিয়া থাকে, যেমন, পদার্থবিজ্ঞান, রসায়ন-বিজ্ঞান, ভূতত্ত্ব ইত্যাদি। কতকগুলি বিজ্ঞান কেবলমাত্র প্রাণশক্তির বিভিন্ন প্রকাশ লইয়া আলোচনা করে, যেমন শারীরবিজ্ঞান, উদ্ভিদবিজ্ঞান, জীববিজ্ঞান, ইত্যাদি। আবার কতকগুলি বিজ্ঞান মনের প্রকাশ লইয়া আলোচনা করে : ইহার মনঃকেন্দ্রী বিজ্ঞান, যেমন, মনোবিজ্ঞান, নীতিবিজ্ঞান, সমাজবিজ্ঞান ইত্যাদি।

২৩ কক্কার ভাষায় : “It would be strange indeed if a science had developed on entirely wrong assumptions.” (*Gestalt Psychology*, p. 25).

অবশ্য প্রকৃতির এই শ্রেণীকরণ অনেকটা কৃত্রিম ব্যাপার, কারণ বাস্তবক্ষেত্রে জড়, প্রাণ ও মনের সম্পূর্ণ পৃথকীকরণ সম্ভব নহে; যেমন, মানুষেরই ভিতর এই তিনটির সমন্বয় আমরা দেখিতে পাই। মানুষের দেহ পৃথকভাবে ধরিলে উহা জড়পদার্থ; তাহা ছাড়া, মানুষ যতক্ষণ জীবিত থাকে, ততক্ষণ উহার ভিতর প্রাণশক্তি বিরাজমান, আবার মানুষ সচেতন মনোবিশিষ্ট জীব।

এখন বিজ্ঞান হিসাবে মনোবিজ্ঞান বৈশিষ্ট্যগুলি লক্ষ্য করা যাউক।

(১) যদি স্রবিস্তার জন্ত আমরা প্রকৃতির এই কৃত্রিম বিভাগ মানিয়া লই, তাহা হইলে বলা বাহুল্য মনোবিজ্ঞান **মনঃকেন্দ্রী বিজ্ঞান (mental science)** হিসাবে স্বীকৃত হইবে।

তবে এখানে লক্ষ্য করিতে হইবে যে, মনোবিজ্ঞান মানুষ ও অন্যান্য প্রাণীর ব্যবহারমূলক বিজ্ঞান এবং প্রাণীর ভিতর (বিশেষতঃ মানুষ ইত্যাদি উচ্চস্তরের জীবের ভিতর) জড়, জীবন ও মন (**matter, life ও mind**)-এর অপূর্ব সমন্বয় ঘটিয়াছে; এবং এই কারণ বিজ্ঞানের জগতে মনোবিজ্ঞান এক বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়াছে। পদার্থবিজ্ঞান ইত্যাদি জড়বিজ্ঞানে প্রাণ ও মনের কথা উঠে না, সেইরূপ প্রাণবিজ্ঞানে মনের কথা আলোচিত হয় না; কিন্তু মনোবিজ্ঞান যখন মনের কথা আলোচনা করে, তখন সে মনের ‘আধার’ স্বরূপ প্রাণময় দেহের রাসায়নিক উৎপত্তি ও গঠন এবং জৈব ব্যবহার—এই দুইটির আলোচনা না করিয়া পারে না। তাহা হইলে বলিতে পারা যায় যে, মনোবিজ্ঞান এমনই একটি বিজ্ঞান যাহার আলোচ্য বিষয়-বস্তুর মধ্যে তথাকথিত ‘জড়’, ‘জীব’ ও ‘মন’ সম্বন্ধীয় আলোচনার সমন্বয় ঘটিয়াছে, যদিও অবশ্য মনকে কেন্দ্র করিয়াই মনোবিজ্ঞান তাহার আলোচনায় ব্যাপৃত থাকে।

২৪ অধ্যাপক কক্কা বলিয়াছেন যে, বৈজ্ঞানিক জড় পদার্থের আলোচনা করেন তাহার পরিমাণের (**quantity**) দিক্ হইতে; জীবদেহের আলোচনার তিনি লক্ষ্য করেন উহার সুশৃঙ্খল ও সুষ্ঠু ব্যবহার (**order**) এবং মনের বেলায় দেখেন অর্থ নিরূপণ (**meaning বা understanding**)-এর ক্ষমতা। দেহধারী সজীব সচেতন মানুষের মধ্যে তিনটি বৈশিষ্ট্যই দেখা যায় বলিয়া মনোবিজ্ঞান এই তিন বিষয়েরই আলোচনা করে। তাহার ভাষায়, “Looking at the sciences of Nature, Life and Mind, we may extract from each one a specific and particularly important concept, viz., from the first: quantity, from the second: order, and from the third: meaning or signi-

(২) আলোচনার সুবিধায় জ্ঞাত বিজ্ঞানকে আমরা বর্ণনামূলক বিজ্ঞান (*positive science*) এবং আদর্শমূলক বিজ্ঞান (*normative science*) এই দুইভাগে বিভক্ত করিয়া থাকি। প্রথমটি, যে বস্তু বা ঘটনা যেমনটি আছে সেইরকম বর্ণনা করে এবং দ্বিতীয়টি, যাহা যে রকম হওয়া উচিত সেই আদর্শের কথা বলে। যেমন, নীতিবিজ্ঞা (*ethics*) আমাদের আদর্শ চরিত্র, অর্থাৎ চরিত্র যেমন হওয়া উচিত, তাহা বলিয়া থাকে; অতএব ইহা আদর্শমূলক বিজ্ঞান।

মনোবিজ্ঞা বর্ণনামূলক বিজ্ঞান। আমাদের মনের অভিজ্ঞতা ও ব্যবহার বাস্তবক্ষেত্রে যে রকম হইয়া থাকে, তাহাই মনোবিজ্ঞা বর্ণনা করিয়া থাকে। আমাদের কি প্রকার চিন্তা করা উচিত, বা কি-প্রকার অনুভূতি থাকা উচিত বা কি-রকম কার্য করা উচিত, তাহা মনোবিজ্ঞার আলোচ্য বিষয়-বস্তু নহে; আমরা বাস্তবক্ষেত্রে কি-রকম ভাবে চিন্তা করি বা অনুভূতি বোধ করি বা কার্য করি তাহাই মনোবিজ্ঞা বর্ণনা করে।

(৩) বিজ্ঞান হিসাবে মনোবিজ্ঞা যে সব সাধারণ নিয়মের প্রবর্তন করে, সেইগুলি অভিজ্ঞতা-নিরপেক্ষ নহে। যে সব মানসিক ঘটনা আমাদের অভিজ্ঞতার ফলে জানা যায়, সেইগুলির ভিত্তিতেই মনোবিজ্ঞা সাধারণ সূত্র (*general law*) প্রবর্তন করিয়া থাকে; অর্থাৎ ইহা আরোহ-মূলক বিজ্ঞান (*inductive science*)।

(৪) মনোবিজ্ঞার একটি নিজস্ব বৈশিষ্ট্য হইল যে, ইহা যাহা কিছু আলোচনা করে তাহা এক বা একাধিক ব্যক্তির মনের সহিত সংশ্লিষ্ট বস্তু বা ঘটনা হিসাবে আলোচনা করে। এইজন্ত বলা হয়, মনোবিজ্ঞা ব্যক্তি-কেন্দ্রিক (*individualistic*)। পদার্থবিৎ (*physicist*) যখন বিদ্যুৎ বা তড়িৎ সম্বন্ধে আলোচনা করিবেন, তখন তিনি ব্যক্তিগত-মনোনিরপেক্ষ থাকেন, অর্থাৎ

ficance (in German *Sinn*). Our Psychology, then, must have a place for all of these." (*Gestalt Psychology*, p. 13).

এ কথা মনে রাখিতে হইবে যে, সকল মনোবিৎই এই দৃষ্টিভঙ্গী গ্রহণ করেন না। ব্যবহারবাদী বা চেষ্টিতবাদীরা (*behaviorists*) মনকে কোন পৃথক্ মর্যাদা দান করেন না। সুতরাং তাঁহারা মনোবিজ্ঞাকে মনঃকেন্দ্রিক বলিবেন না। ব্যবহারবাদী না হইয়াও একদল মনোবিৎ মনোবিজ্ঞাকে একপ্রকার জীববিজ্ঞা (*biological science*) বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। Zangwill বলেন, „...Modern Psychology is gradually taking shape as a branch of biological science". (*Introduction to Modern Psychology*, p. 19).

উহাতে তাঁহার কী মনে হইল সে সম্বন্ধে তিনি উদাসীন। মনোবিৎ যখন উহা আলোচনা করিবেন, তখন তিনি লক্ষ্য করিবেন যে, বিদ্যাতের প্রকাশ প্রত্যক্ষ করিয়া বা তড়িৎ শক্তির সংস্পর্শে আসিয়া ব্যক্তি-বিশেষের মনে কী প্রতিক্রিয়া দেখা দিল; অর্থাৎ মনোবিৎ যখন কিছু বস্তু বা ঘটনা সম্বন্ধে আলোচনা করেন, তখন তিনি দেখেন যে, উহা কোন মানুষের মনে কী সংবেদন ঘটাইল বা কী আশা-আকাঙ্ক্ষা জাগাইয়া তুলিল বা স্মৃতি-স্মরণের সৃষ্টি করিল বা অন্য কোনরূপ প্রতিক্রিয়ার উদ্ভব করাইল।

ইহার অর্থ এমন নহে যে, মনোবিৎ তাঁহার নিজের বা কোন একজনের মনকে অনুধাবন করিয়াই সন্তুষ্ট থাকেন; তাহা হইলে মনোবিজ্ঞান বিজ্ঞান পদবাচ্য হইতে পারিত না, কারণ বিজ্ঞান চেষ্টা করে এমন কতকগুলি সাধারণ নিয়ম আবিষ্কার করিতে যাহা সর্বকালীন, সর্বজনীন সত্য বলিয়া স্বীকৃত হইবে। মনোবিজ্ঞানকে ব্যক্তি-কেন্দ্রিক বলার উদ্দেশ্য হইল যে, ব্যক্তির মনের সহিত সংস্রবহীন অর্থাৎ ব্যক্তির মনের উপর কোন প্রকার পরিবর্তন বা প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করিতে পারে না এমন কোন কিছু মনোবিদ্যা আলোচনা করে না।

তাহা হইলে দেখা যাইতেছে যে, বিজ্ঞান হিসাবে মনোবিদ্যার অগ্রতম বৈশিষ্ট্য হইল যে, ইহা ব্যক্তি-কেন্দ্রিক অথচ অগ্রাগ্র বিজ্ঞানের দ্বারা ইহা সার্বিক নিয়মের অনুধাবন করে।^{২৫} (পৃ: ২৯ দ্রষ্টব্য)।

(৫) বিজ্ঞান হিসাবে মনোবিদ্যার আর একটি নিজস্ব বৈশিষ্ট্য যে মনোবিদ্যাই একমাত্র বিজ্ঞান যাহা তাহার বিষয়বস্তু আলোচনা করার জন্য দুইটি

২৫ তুলনীয় : (১) "Psychology may be individualistic without being confined exclusively to the introspective method. There is nothing to hinder the psychologist from employing materials furnished by his observations of other men, of infants, of the lower animals, or of the insane; nothing, to hinder him taking counsel with the philologist or even the physiologist, provided always he can show the psychological bearings of these facts which are not directly psychological. But by whatever methods, from whatever sources its facts are ascertained they must—to have a psychological import—be regarded as having a place in, or as being a constituent of, *someone's experience*." (James Ward, *Psychological Principles*, p. 27).

(২) "...it is the subjective point of view which is distinctly characteristic of Psychology as contrasted with other branches of human

পদ্ধতি (method) অনুধাবন করিয়া থাকে; এই দুইটি পদ্ধতি হইল অন্তর্দর্শন (introspection) এবং বিষয়গত পদ্ধতি (objective method)। মন সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ দুইটি উপায়ে হয়—অন্তর্দর্শন দ্বারা নিজের মনকে জানা যায় এবং বিষয়গত পদ্ধতি দ্বারা অপরের মনকে জানা যায়। মনোবিজ্ঞান ব্যতীত অন্যান্য সকল বিজ্ঞান মাত্র একটি পদ্ধতি অবলম্বন করিতে পারে এবং তাহা হইতেছে বিষয়গত পদ্ধতি। পদার্থবিৎ যখন বিদ্যুৎ, চুম্বক ইত্যাদি লইয়া আলোচনা করেন, অথবা উদ্ভিদবিৎ যখন উদ্ভিদের গঠনাদি লইয়া আলোচনা করেন, তখন কোন মানসিক অভিজ্ঞতার কথা উঠে না, অর্থাৎ এখানে অন্তর্দর্শনের কোন প্রশ্ন নাই। মনোবিজ্ঞানে কিন্তু অন্তর্দর্শন প্রয়োজন—অপরের মনকে জানিতে হইলে প্রথমে নিজের মনকে জানা প্রয়োজন; আবার মনোবিৎ যদি কেবল নিজের মন লইয়াই আলোচনা করিতেন, তাহা হইলে কখনও বিজ্ঞান গড়িয়া উঠিত না।^{২৬} সেইজন্য মনোবিজ্ঞানে অন্তর্দর্শন ও বিষয়গত পদ্ধতি বা বাহ্যদর্শন এই দুইটি পদ্ধতিই অনুসৃত হয়।

(৬) অন্যান্য বিজ্ঞানের তুলনায় মনোবিজ্ঞানের সহিত দর্শনের সম্পর্ক বিশেষ ঘনিষ্ঠ বলিয়া বোধ হয়। যদিও সকল বিজ্ঞানের সহিতই দর্শনের সম্পর্ক আছে, দর্শনের সহিত মনোবিদ্যার সম্পর্ক অধিকতর নিকট, কারণ মনোবিজ্ঞান জ্ঞানের উৎপত্তি ও স্বরূপ লইয়া আলোচনা করে এবং দর্শনও (বিশেষতঃ ইহার যে অংশ জ্ঞানবিজ্ঞান বা epistemology বলিয়া পরিচিত) ঐ বিষয়ের আলোচনায় সমধিক আগ্রহান্বিত। তাহা ছাড়া, মনোবিজ্ঞানের আলোচনা দর্শনের বিবিধ শাখাকে—যথা, নীতি-দর্শন (moral philosophy), সমাজ-দর্শন (social philosophy), রাষ্ট্রনীতি-দর্শন (political philosophy), নন্দন-তত্ত্ব (aesthetics) ইত্যাদিকে—স্ব স্ব বিষয়-

knowledge.....it should be clear that this cannot involve an entire refusal to take account of objects.....What is really distinctive of its procedure is that it takes account of objects only in their relation to a subject.....only in so far as some mind *minds* them, or in so far as someone immediately experiences them". (G. F. Stout, *A Manual of Psychology*, pp. 3, 4).

২৬ পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, ব্যবহারবাদী মনোবিদগণ অন্তর্দর্শনের সম্ভাবনাকে স্বীকার করেন না, কারণ তথাকথিত দেহ-বস্তুর অন্তরালে 'মন' বলিয়া কোন কিছুই অস্তিত্ব তাঁহারা মানেন না।

বস্তু আলোচনায় সাহায্য করে। সুতরাং মনোবিজ্ঞা যে সমস্ত বিষয় আলোচনা করে তাহা দর্শনকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করে।^{২৭}

(৭) এখন প্রশ্ন উঠিতে পারে মনোবিজ্ঞা প্রাকৃতিক বিজ্ঞান (natural science) কি না।

এই বিতর্কমূলক প্রশ্নের উত্তর দিবার পূর্বে প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের বৈশিষ্ট্যগুলি লক্ষ্য করিতে হইবে।

প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের বৈশিষ্ট্য হইল যে, (ক) ইহা প্রকৃতির কোন বিশেষ অংশ লইয়া সূক্ষ্মল পদ্ধতিতে আলোচনা করে; (খ) ইহা প্রাকৃতিক ঘটনাগুলি প্রাকৃত উপায়ে ব্যাখ্যা করিবার চেষ্টা করে অর্থাৎ প্রাকৃত ঘটনাকে অতিপ্রাকৃত উপায়ে ব্যাখ্যা দান করে না; (গ) ঐ সব প্রাকৃত ঘটনাগুলির পশ্চাতে যে সমস্ত নিয়ম আছে, ইহা সেইগুলি আবিষ্কারের চেষ্টা করে এবং এইজন্য প্রকৃতির একরূপতা এবং কার্যকারণ-সম্বন্ধ-নীতির উপর নির্ভর করে; (ঘ) ইহার বিষয়বস্তু আলোচনা করিবার জন্য ইহা পর্যবেক্ষণ, পরীক্ষণ, বিশ্লেষণ, সংশ্লেষণ ইত্যাদি উপায় অবলম্বন করিয়া থাকে। [বর্তমান অধ্যায়ের ১ম অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য।]

এখন দেখা যাউক যে এখানে ‘প্রকৃতি’ পদটি আমরা কি অর্থে গ্রহণ করিয়া থাকি। সাধারণতঃ ‘প্রকৃতি’ কথাটির দ্বারা জড় এবং জৈব প্রকৃতি বুঝায়, কিন্তু তাহা দ্বারা চেতনা বা মন সূচিত হয় না। সেইজন্য প্রকৃতি-বিজ্ঞানের সাধারণ পুস্তকে জড়ের বিভিন্ন প্রকাশ এবং উদ্ভিদ ও বিভিন্ন প্রাণী সম্বন্ধে আলোচনা থাকে। ‘প্রকৃতি’ পদটি আবার ব্যাপক অর্থেও ব্যবহৃত হইতে পারে এবং প্রকৃতির ভিতর জড় ও প্রাণ ব্যতীত মনকেও অন্তর্ভুক্ত করা যাইতে পারে। যদি

২৭ অধ্যাপক জেম্‌স্‌ এই বিষয়ে ইঙ্গিত করিয়া বলিয়াছেন: “...She (Psychology) assumes additional data peculiarly her own, and leaves it to more developed parts of philosophy to test their ulterior significance and truth. These data are—

1. *Thoughts and feelings*, or whatever other names transitory states of consciousness may be known by.

2. *Knowledge*, by these states of consciousness, of other things..... The full truth about states of mind cannot be known until both Theory of Knowledge and Rational Psychology have said their say.” (Psychology : Briefer Course, p. 2.).

এইরূপ ব্যাপক অর্থে 'প্রকৃতি' পদটি গ্রহণ করা হয়, তাহা হইলে মনোবিজ্ঞানকে প্রাকৃতিক বিজ্ঞান বলা যাইতে পারে। তবে স্মরণ রাখিতে হইবে যে, অগ্ণাত প্রচলিত প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের তুলনায় মনোবিজ্ঞান স্থান বিশেষ প্রকারের; কারণ অগ্ণাত বৈজ্ঞানিক যে মনের সাহায্যে তাঁহাদের পৃথক পৃথক বিষয়বস্তু আলোচনা করিয়া থাকেন, সেই মন লইয়াই মনোবিদগণ আলোচনা করেন এবং মনকে তাঁহাদের প্রধান বিষয়বস্তু করার জন্য একমাত্র মনোবিদগণই অন্তর্দর্শন ও বাহ্যদর্শন এই দুইটি পদ্ধতি অবলম্বন করেন। তাহা ছাড়া, জড়বিজ্ঞানে কার্যকারণসম্বন্ধীয় নিয়ম (causal laws) যান্ত্রিকতাবাদের দৃষ্টিভঙ্গী (mechanistic standpoint) হইতে প্রযুক্ত হইয়া থাকে, অর্থাৎ সাধারণ জড়বিজ্ঞানী বিশ্বাস করেন যে, একই কারণ যতবারই দেখা দিবে ততবারই একই প্রকার কার্য উৎপাদিত হইবে এবং যখন অচেতন জড় কারণ ভাবে কাজ করিয়া থাকে, তখন পূর্ব পরিকল্পিত উদ্দেশ্য-সাধনের প্রশ্ন উঠে না; কিন্তু মানুষের বাহ্য ব্যবহারে (বিশেষতঃ ঐচ্ছিক ক্রিয়ার পশ্চাতে) পূর্বপ্রকল্পিত উদ্দেশ্যসাধনের প্রচেষ্টা থাকে। সেই কারণ, মনোবিজ্ঞান যান্ত্রিকতাবাদ দ্বারা মনের স্তূৰ্ণ ব্যাখ্যা করিতে পারে না—যে সমস্ত মনোবিৎ যান্ত্রিকতাবাদ গ্রহণ করিয়াছেন তাঁহাদের ব্যাখ্যা ত্রুটিপূর্ণ।

জড়বাদী ও ব্যবহারবাদী লেখকগণ মনোবিজ্ঞানকে প্রাকৃতিক বিজ্ঞান বলিয়াছেন। তাহা ছাড়া, অগ্ণাত মতাবলম্বী লেখক যাহারা মনের সত্তা স্বীকার করেন, তাঁহারাও অনেকে মনোবিজ্ঞানকে প্রাকৃতিক বিজ্ঞান বলিয়াছেন।^{২৮} আমরা উপরে যাহা বলিয়াছি তাহারই পুনরুল্লেখ করিয়া বলিব যে, যদি মনোবিজ্ঞানকে নিতান্তই প্রাকৃতিক বিজ্ঞান বলিতে হয়, তাহা হইলে

২৮ আমেরিকার ব্যবহারবাদী মনোবিৎ ওয়াটসন্ ইত্যাদি মনোবিজ্ঞানকে প্রাকৃতিক বিজ্ঞান বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। ওয়াটসন্ মনোবিজ্ঞান সংজ্ঞা-দান কালে বলিয়াছেন: "Psychology is that division of *natural science* which takes human behavior.....as its subject-matter." সেইরূপ J. F. Dashiell কারণ দেখাইয়াছেন: "The study of psychology aims to get at.....knowledge by the procedure of natural science. This procedure is not one of observing concrete persons as wholes in complex social situations. Rather, it involves very painstaking *analysis* of man's behavior to determine specific *causal sequences* from which to develop *formal laws, principles, even formulae* which.....form the subject matter of a pure science." (*Fundamentals of*

‘প্রকৃতি’ পদটি ব্যাপক অর্থে গ্রহণ করিতে হইবে এবং মানসিক ব্যবহারের ব্যাখ্যা-পদ্ধতি যে যান্ত্রিক ব্যবহারের ব্যাখ্যা-পদ্ধতি হইতে পৃথক্ তাহা স্বরণ রাখিতে হইবে।

একদল লেখক এইজন্ত মনে করেন যে, এইরূপ বিশেষ অর্থে বা সর্ভাধীনে মনোবিজ্ঞাকে প্রাকৃতিক বিজ্ঞান আখ্যা দেওয়া অপেক্ষা উহাকে শুধু বিজ্ঞান বলাই সমীচীন হইবে। তাঁহারা মনে করেন যে, মনোবিজ্ঞাকে প্রাকৃতিক বিজ্ঞান বলিলে জড় ও মন, অচেতন ও চেতন, এই দুইয়ের মধ্যে যে পার্থক্য আছে তাহা অবলুপ্ত হইয়া অকারণ বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হইবে। জড় বিজ্ঞানগুলির মধ্যে গতি-বিজ্ঞান (dynamics) ঠিক জড় লইয়া আলোচনা করে না বলিয়া যেমন উহা বিশেষ প্রকারের বিজ্ঞান, সেইরূপ মনঃকেন্দ্রী বিজ্ঞানগুলির মধ্যে মনোবিজ্ঞা এক বিশেষ প্রকারের অনুপম বিজ্ঞান।^{২৯} এই বিজ্ঞানকে কোন বিশেষণে বিশেষিত করিবার প্রয়োজন নাই।

তবে সাম্প্রতিক কালে মনোবিদগণের মধ্যে (বিশেষতঃ একদল জার্মান মনোবিদগণের মধ্যে) আর একটি আন্দোলন দেখা দিয়াছে। একদল লেখক (যথা, Dilthey, Spranger ইত্যাদি) বলেন যে, প্রাকৃতিক বিজ্ঞান কেবলমাত্র কার্যকারণ-সম্বন্ধ-নীতি দ্বারা ঘটনার ব্যাখ্যা করিয়া থাকে; কিন্তু মনোবিজ্ঞা ব্যক্তির ব্যক্তিত্বের মূল্য বা অর্থ (value বা significance) নিরূপণের চেষ্টা করে এবং এইজন্ত যে কৃষ্টির মধ্যে ব্যক্তি-বিশেষ জীবন অতিবাহিত করে, সেই কৃষ্টির সহিত তাহার সম্বন্ধ নির্ধারিত করা প্রয়োজন। ব্যক্তিত্বের পরীক্ষণের জন্ত গাণিতিক পরিমাপ সম্ভব নহে; সুতরাং সাধারণ প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের পদ্ধতি

Objective Psychology. pp. 8, 9).

ব্যবহারবাদী না হইয়াও অনেক আধুনিক মনোবিৎ মনোবিজ্ঞাকে প্রাকৃতিক বিজ্ঞান বলেন। মনোবিজ্ঞা যখন বিজ্ঞান হিসাবে স্বীকৃতি পাইল, তখন হইতেই ইহাকে অনেক লেখক অস্বাভাবিক বিজ্ঞানের সমপর্যায়ভুক্ত করিবার জন্ত প্রাকৃতিক বিজ্ঞান বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। বিগত শতাব্দীর শেষভাগে W. James তাঁহার পুস্তকে লিখিয়াছিলেন, “Psychology is to be treated as a natural science.” পরবর্তী অনেক লেখক ব্যবহারবাদী বা জড়বাদী না হইয়াও এইরূপ মত প্রকাশ করিয়াছেন।

২৯ এই বিষয়ে Villa-র মত লক্ষণীয়; Villa বলেন : “The position of the special sciences is as follows :—On the one hand, the physical, chemical, and biological sciences, and above them all, the science of Dynamics; on the other hand, the moral, historical, philological and social sciences, with Psychology at their head...Psychology among the mental sciences

এখানে প্রযুক্ত হইতে পারে না। এই জন্ত ইহারা বলেন যে, মনোবিজ্ঞান একপ্রকার কৃষ্টিমূলক বিজ্ঞান ৩০ (*Kulturwissenschaft*—কাল্টুর্ভিসেন্শাফ্ট—অর্থাৎ Science of culture, অথবা *Geisteswissenschaft*—গাইস্টেস্ ভিসেন্শাফ্ট অর্থাৎ Science of the Spirit)। জার্মানী পাশ্চাত্য ভাববাদী দর্শন (idealistic philosophy)-এর জন্মস্থান এবং যদিও ভুণ্ড্ট্ (Wundt) ইত্যাদি মনীষীর প্রচেষ্টায় মনোবিজ্ঞান একদিন পরীক্ষণের উপর প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, তথাপি ভাববাদী দর্শনের প্রভাবে আজিকার দিনের মনোবিজ্ঞান জার্মানীতে এক নবরূপ ধারণ করিতে চলিয়াছে। এই নব্য মনোভাব আমেরিকার লেখকদের উপর কিছু কিছু প্রভাব বিস্তার করিতেছে। ৩১ জাতি ও সমাজের কৃষ্টি হইতে ব্যক্তিকে বিচ্ছিন্ন করিয়া ব্যক্তির বিশ্লেষণ করা মনোবিজ্ঞানের পক্ষে সম্ভব নহে, এই অভিমত অনেক আধুনিক লেখকই প্রকাশ করিয়াছেন।

would be analogous to Dynamics among the physical, being a special science like the latter, although of a very general character." (*Contemporary Psychology*, p. 81).

৩০ তুলনীয় : (১) "Whereas these sciences (natural sciences)...legitimately sought to 'explain', Psychology should endeavour only to 'describe' or 'understand', through a sort of intuitive apprehension of 'meaning' or of the relations of parts to a greater whole, often the whole that is provided by the cultural milieu—a view which has become associated with the names *Geisteswissenschaft* or *Kulturwissenschaft*." (J. C. Flugel, *A Hundred Years of Psychology*, p. 381).

(২) "Professor E. Spranger of the University of Berlin is a prominent representative of what is called the 'understanding psychology' in distinction from explanatory or causal psychology. To 'understand' is to grasp the meaning of something...To understand an individual, we have not to dissect him nor even to consider him as a whole apart from his environment, but to see him in his social relationships and to see his present in relation to his past." (R. S. Woodworth, *Contemporary Schools of Psychology*, p. 222).

৩১ যথা, স্প্রাঙ্গার (Spranger)-এর লেখা আমেরিকাবাসী আলপোর্ট (Allport) ও ভার্নন (Vernon)-কে প্রভাবিত করিয়াছে।

আমরা ২৬ পৃষ্ঠায় Dashiell-এর পুস্তক হইতে যে উদ্ধৃতি দিয়াছি, তাহাতে তিনি ব্যক্তিকে জটিল সামাজিক পরিবেশের সহিত সংশ্লিষ্ট দেখিতে নিবেদন করিয়াছেন। কিন্তু বর্তমানের বহু লেখকই (যথা, Murphy, Young, Krech, Crutchfield ইত্যাদি) সমাজ-মনোবিজ্ঞান (Social Psychology)-র প্রগতির সহিত মানবমনকে সমাজের পরিপ্রেক্ষিতেই আলোচনা করিয়াছেন।

বর্তমান পরিস্থিতিতে প্রাকৃতিক বা 'কৃষ্টিমূলক' এইরূপ কোন বিশেষণ দ্বারা মনোবিচারকে অভিহিত করা হুৱুহ। এইজন্ত মনোবিচারকে এক বিশেষ প্রকারের বিজ্ঞান বলিতে হইবে—ইহা এমনই এক বিজ্ঞান যাহা সম্পূর্ণরূপে প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের পদ্ধতি অনুসরণ করিতে পারে না, অথচ ঐ পদ্ধতি দ্বারা প্রগতির পথে, অনেকটা অগ্রসর হইয়াছে। বিজ্ঞান হিসাবে মনোবিচার যথাযথ দৃষ্টিভঙ্গী কি হইবে তাহা আজও ভবিষ্যতের গর্ভে নিহিত^{৩২}—বর্তমানে আমাদের পক্ষে উদার দৃষ্টিভঙ্গী রাখাই বাঞ্ছনীয়।

সংযোজন :

মনোবিচার নিয়মগুলির স্বরূপ কি ?

একদল লেখক (যথা, অলপোর্ট ইত্যাদি) মনে করেন যে, ব্যক্তিবিশেষকে কেন্দ্র করিয়া মনোবিচার আলোচনা এবং যেহেতু ব্যক্তিমাত্রেরই একটা অদ্বিতীয়ত্ব (uniqueness) আছে, সেইহেতু ব্যক্তিকে ভিত্তি করিয়া মনোবিচার কোন সার্বিক নিয়ম দান করিতে পারে না।^{৩৩}

এই আপত্তির উত্তরে বলা যাইতে পারে যে, ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে পার্থক্য (যাহাকে ইংরাজীতে বলা হয় individual differences) থাকিলেও ব্যক্তিমাত্রই কতকগুলি সাধারণ ধর্ম (common characteristics)-এর ধারক। ব্যক্তিমাত্রেরই আহাৰ, পান, চিন্তা, বিশ্রাম ইত্যাদির প্রয়োজন আছে; ব্যক্তিমাত্রেরই প্রত্যক্ষ, স্মৃতি, শিক্ষণ ইত্যাদির ক্ষমতা আছে। সুতরাং মনোবিচার সার্বিক নিয়মগুলির আকার এইরূপ হইবে : “যদি ক খ গ অবস্থার মধ্যে ‘অ’ উপাদানের পরিবর্তন হয়, তাহা হইলে ‘আ’ উপাদানেরও পরিবর্তন ঘটিবে।” যেমন-অনুঘটকের ফলে স্মৃতি জন্মে; সুতরাং সহ-অবস্থানকারী দুইটি বস্তুর একটি মনে পড়িলে আর একটি মনে

৩২ আমরা এখানে ফ্লুগেল (Flugel)-এর অভিমতের প্রতিধ্বনি করিতেছি। তিনি বলেন : “Only the future can conclusively show whether the experimentalists have rashly embarked upon what must eventually prove to be a hopeless enterprise or whether *Geisteswissenschaft* is a timid and reactionary movement that has unreasonably sought to deprive psychology of all the advantages that follow from the attainment to full scientific status.” (*A Hundred Years of Psychology*, p. 383).

৩৩ Allport-এর মতে মনোবিচার অনুসন্ধান-প্রণালী হইবে idiographic (ব্যক্তি-কেন্দ্রিক), nomothetic (সার্বিক নিয়মানুগ) নহে।

পড়িবে। সাধারণ মানুষ ক্ষুধার অধীন; অতএব কেহ যদি ২৩ দিন উপবাসী থাকে বা স্বপ্নাহারে থাকে, তাহা হইলে তাহার ক্ষুধার তাড়না তীব্র হইবে। মানুষ মাত্রেরই পরিশ্রম করিলে বিশ্রামের প্রয়োজন হয়; অতএব যে ক্রমান্বয়ে কয়েকদিন পরিশ্রম করিয়াছে, সে সহজেই গভীরভাবে নিদ্রামগ্ন হইবে। এইভাবে আমরা মনোবিজ্ঞান সার্বিক নিয়মের প্রয়োগ করিতে পারি।^{৩৪} এই ব্যাপারে মনোবিজ্ঞান অত্যাগ্ৰ বিজ্ঞান অপেক্ষা পশ্চাৎপদ নহে।

তাহা ছাড়া, পদার্থবিজ্ঞান, রসায়নশাস্ত্র ইত্যাদি বিজ্ঞানেরও তথাকথিত সার্বিক নিয়মের সর্বজনীনত্ব লইয়া মতভেদ আছে। সূক্ষ্ম অনুসন্ধানের ফলে ইহাদেরও সার্বিক নিয়মের ব্যতিক্রম দেখা যায়।^{৩৫}

মনোবিজ্ঞান নিয়মের সার্বিকতা সম্বন্ধে মতভেদের অন্ততম কারণ হইল যে, কেহ কেহ মনোবিদের নিকট আশা করেন যে, তিনি যেন ব্যক্তি-বিশেষের স্বদূর ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে সঠিক নির্দেশ দেন। ইহাদের আমরা এই কথা বলিতে পারি যে, হস্তরেখাবিৎ জ্যোতিষীর নিকট যে মনোভাব লইয়া লোকে যায় সেই মনোভাব লইয়া মনোবিদের নিকট যাওয়া উচিত

৩৪ ব্যক্তিগত পার্থক্য থাকার জন্য কাহার স্মৃতি প্রথর হইবে বা কে কী স্মরণ করিবে, উপবাসের পর কাহার ক্ষুধার তাড়না কত তীব্র হইবে, বা পরিশ্রমের পর কাহার কতক্ষণ বিশ্রামের প্রয়োজন, তাহা সাধারণভাবে আমরা বলিতে পারি না। তবে সকল মানুষের ক্ষেত্রেই যে অশূন্যবদ্ধ বস্তুগুলির একটি অপরটিকে মনে করাইয়া দিতে পারে, বা উপবাসের পরে ক্ষুধার তাড়না দেখা দিবে (যদিও কেহ কেহ উহাকে সংযত করিতে পারেন), বা অতিরিক্ত পরিশ্রমে ক্লান্তি আসিবে—সাধারণভাবে এই কথা আমরা বলিতে পারি।

৩৫ তুলনীয় : Brett's *History of Psychology* (পৃ: ৭১৯) : "...it is very doubtful whether they (other sciences) have many laws in the sense of statements expressing functional relationships which hold universally, and which have been rigorously tested. And, incidentally, there are very few sciences which have laws in this sense."

পদার্থবিজ্ঞান ইত্যাদি বিজ্ঞানের 'সার্বিক' নিয়ম সম্বন্ধে আধুনিক বৈজ্ঞানিকের দৃষ্টিভঙ্গী আলোচনা করিয়া প্রখ্যাতনামা দার্শনিক বাট্রাণ্ড রাসেল নিম্নলিখিত মন্তব্য করিয়াছেন : "Modern Physics does not use induction in the old sense at all. It makes enormous theories without pretending that they are in any exact sense true and uses them only hypothetically until new facts turn up which require new theories." কারণ-সম্বন্ধীয় নীতির তথাকথিত একরূপতার বিষয় তিনি বলেন : "...let us not be too dogmatic. There are those who say that...the apparent regularities of the world are only due to the law of averages..." (*Portraits from Memory*, p. 116).

নহে। তাহা ছাড়া, বিশেষ ব্যক্তি বা বস্তুর ব্যবহার সম্বন্ধে নির্ভুল ভবিষ্যদ্বাণী করা কোন বিজ্ঞানেরই কার্য নহে। ৩৬

মনোবিজ্ঞান নিয়ম সম্বন্ধে ইহা স্মরণ রাখিতে হইবে যে, যদি কোন বৈশিষ্ট্য আমরা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই লক্ষ্য করি এবং উহাকে নিছক আকস্মিক বলিয়া অগ্রাহ্য করা না যায়, তাহা হইলেই উহাকে মনোবিজ্ঞান সাধারণ নিয়মের পর্যায়ভুক্ত করা উচিত। ৩৭

৫। মনোবিজ্ঞান পরিসর বা অনুসন্ধানক্ষেত্র (Field or Scope* of Psychology) :

মনোবিজ্ঞান বিষয়বস্তু মন, এবং মনের ব্যাপকতা যতদূর মনোবিজ্ঞান আলোচনার পরিধিও ততদূর। আমরা বিশ্বাস করি, মনুষ্য ব্যতীত মনুষ্যের প্রাণীরও মন আছে, আবার ব্যক্তি-বিশেষকে অতিক্রম করিয়া সামাজিক-গোষ্ঠীরও এক বিশেষ অর্থে নিজস্ব মানসিক বৈশিষ্ট্য আছে। সুতরাং প্রাণি-মন এবং সমাজ-মন মনোবিজ্ঞান পরিধির অন্তর্গত। আবার সাধারণ মনের বৈশিষ্ট্য জানিবার জন্য অস্বভাবী মনের পর্যালোচনা করা প্রয়োজন। তাহা ছাড়া, মনোবিজ্ঞান উন্নতির সহিত শিক্ষা, শিল্প ইত্যাদি বহুক্ষেত্রে মনোবিজ্ঞান প্রয়োগ হইতেছে। এইভাবে মনোবিজ্ঞান পরিধি ক্রমবর্ধমান।

৩৬ ডুলনার : "Objectioners to psychology often muddle prediction with prophecy and ridicule psychologists because they cannot prophesy whether a boy will choose an academic career or whether a politician will break a promise. But...our meteorologists are not derided because they cannot predict for a long time ahead the particular type of weather in a particular place... Yet psychologists are often accused of being pseudo-scientists because they cannot make analogous prophecies. A scientific law asserts a functional relation between variables ; it is not a Revelation of Destiny." (Brett's *History of Psychology*, p. 220).

৩৭ ওয়েনার উল্খ (Warner Wolff) বলেন : "What we call laws in psychology are derived from a majority of cases based on occurrences which are more frequent than the laws of chance would allow, Thus a psychological result is significant if it occurs in, say, 60 per cent of the cases when chance would allow 35 per cent, but insignificant when chance would allow 50 per cent." (*Essentials of Psychology*, p. 20).

* ইংরাজী 'scope' শব্দটি বিষয়বস্তু বা subject-matter এই অর্থে সাধারণতঃ গ্রহণ করা হয় ; আবার 'scope' পদটি নিষ্কৃতি বা প্রয়োগ-ক্ষেত্রেও বুঝায়। অধ্যাপক টিচনার এই শব্দোক্ত অর্থে 'scope' পদটি ব্যবহার করিয়াছেন। তাহার *A text-book of Psychology*, পৃ: ২১-৩০ দ্রষ্টব্য। বর্তমান গ্রন্থের ১-২ পৃষ্ঠায় মনোবিজ্ঞান সাধারণ বিষয়বস্তু আলোচিত হইয়াছে।

এইজ্ঞান ক্রমে প্রাণি-মনোবিজ্ঞান, সমাজ-মনোবিজ্ঞান, অস্বভাবি-মনোবিজ্ঞান, শিশু-মনোবিজ্ঞান, শিক্ষা-মনোবিজ্ঞান, শিল্পী-মনোবিজ্ঞান ইত্যাদি বিভিন্ন শাখার উদ্ভব হইয়াছে।

মনোবিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখার আবার বহু উপশাখা থাকিতে পারে। যেমন, সাধারণ মনোবিজ্ঞানের আলোচ্য প্রতিটি বিষয় সম্বন্ধে পৃথক্ পৃথক্ আলোচনা চলিতে পারে; যথা, চিন্তন-সম্বন্ধীয় মনোবিজ্ঞান (Psychology of Thinking), কল্পনা-সম্বন্ধীয় মনোবিজ্ঞান (Psychology of Imagination) ইত্যাদি। সেইরূপ সমাজ-মনোবিজ্ঞানের বিভিন্ন উপশাখা থাকিতে পারে; যথা, জাতি-মনোবিজ্ঞান (Psychology of Race), জনতা-মনোবিজ্ঞান (Psychology of Crowd), সামাজিক প্রথা-সম্বন্ধীয় বা রীতি-সম্বন্ধীয় মনোবিজ্ঞান (Psychology of Customs, Psychology of law) ইত্যাদি। আবার অস্বভাবি-মনোবিজ্ঞানের আলোচনার যেমন একটি তাত্ত্বিক দিক আছে, সেইরূপ প্রায়োগিক দিকও আছে; এইজ্ঞান মনোরোগবিজ্ঞান (Psychiatry), চিকিৎসা-সম্বন্ধীয় মনোবিজ্ঞান (Medical Psychology) ইত্যাদি বিভাগ দেখা দিয়াছে। শিল্পোন্নতির সহিত উপযুক্ত কর্ম-নির্বাচন, কর্মীদের মধ্যে শান্তিসংরক্ষণ ইত্যাদি সমস্ত ক্ষেত্রে মনোবিজ্ঞানের প্রভূত প্রয়োগ হইতেছে; সেইরূপ শিক্ষা-সংক্রান্ত সমস্ত দূরীকরণকল্পে নানাভাবে মনোবিজ্ঞানের সাহায্যগ্রহণ করা হইতেছে। এইভাবে শিক্ষা-মনোবিজ্ঞান ও শিশু-মনোবিজ্ঞানের আবার প্রচুর বিস্তৃতি ঘটিতেছে। বর্তমান শতাব্দীতে দুইটি মহাযুদ্ধের ফলে মনোবিজ্ঞানের বিস্তৃততর প্রয়োগ ঘটিয়াছে—কি করিয়া স্ব-দলে নৈতিক দৃঢ়তা রক্ষা করা যায়, কিভাবে শত্রুমনকে প্রভাবিত করা যায়, কিভাবে প্রচারণা চালান যায়, কিভাবে সৈনিক-নির্বাচন করিতে হয়, কিভাবে সেনানায়ক তাঁহার নেতৃত্ব রক্ষা করিতে পারেন, কি ভাবে ক্লান্তি নিবারণ করা যায় ইত্যাদি বহু বিষয়ে যুদ্ধকালে মনোবিদদের পরামর্শ গ্রহণ করা হইয়া থাকে। এই সব বিভিন্ন কারণে মনোবিজ্ঞানের প্রয়োগ-ক্ষেত্র অধিকতর ব্যাপক হইয়াছে।

[এই সকল বিভিন্ন শাখার বিষয়বস্তুর বিস্তারিত আলোচনা তৃতীয় অধ্যায়ে করা হইবে]।

দ্বিতীয় অধ্যায়

পর্যবেক্ষণ-পদ্ধতি

১। উপাত্ত ও পর্যবেক্ষণ-পদ্ধতি (Data and methods of Observation) :

সুসংবদ্ধ, সামঞ্জস্যপূর্ণ, সাধারণ জ্ঞান দান করাই বিজ্ঞানের লক্ষ্য। এইজন্য বিজ্ঞানমাত্রই বিশেষ উদ্দেশ্য প্রণোদিত হইয়া কতকগুলি উপাত্ত (data) সংগ্রহ করে এবং সেইগুলিকে ধীরচিন্তে সূষ্ঠাভাবে পর্যবেক্ষণ করে ও পরিশেষে উহাদের বিশেষ বিশেষ গুণাবলী এবং সাধারণ-ধর্ম নিরূপণের চেষ্টা করিয়া থাকে।

মনোবিজ্ঞান 'উপাত্ত' বলিতে আমরা বুঝি মানসিক অবস্থা ও কার্যধারা (subjective mental states and processes) এবং উহাদের সহিত সংশ্লিষ্ট উদ্দীপক ও প্ররোচক বস্তু বা বিষয় (object)। এই 'বস্তু' বা 'বিষয়' কাকে বলে? যাহা কিছু আমাদের মন 'মানসিক পরিবর্তন সূচনাকারী' বলিয়া নির্দেশ করে বা ইঙ্গিত করে, তাহাই মনোবিজ্ঞান পরিপ্রেক্ষিতে 'বিষয়' নামে অভিহিত।^১ এই 'বিষয়' বাস্তবজগতের বস্তু হইতে পারে আবার নিছক কাল্পনিক বস্তুও হইতে পারে। যখন একটি ছাত্র জাগ্রত অবস্থায় কোন পুস্তক পাঠ করে, তখন ঐ পুস্তকও যেমন একটি 'বিষয়', সেইরূপ স্বপ্নাবস্থায় যখন সে একটি পুস্তক 'অবলোকন' করে, তাহাও মনোবিজ্ঞান দৃষ্টিতে একটি 'বিষয়'। আবার বর্তমান উদাহরণে উপাত্ত বলিতে বুঝিব 'পুস্তক-দ্বারা-উদ্দীপিত মানসিক-অবস্থা', অর্থাৎ পুস্তক (উদ্দীপক) এবং মানসিক অবস্থা ইহাদের পৃথক পৃথক ভাবে বুঝিলে চলিবে না।

^১ তুলনীয় : G. F. Stout, *A Manual of Psychology*, pp. 34, 35 : "...these data include not only subjective states, but also, as inseparable from these, their objects, *as such*."

"Whatever any conscious individual means or intends to refer to is an object for that individual at the moment at which he means or intends to refer to it."

পূর্বেই (পৃ: ২৪) বলা হইয়াছে, মনঃপর্যবেক্ষণের পদ্ধতি দুইটি—অন্তর্দর্শন (subjective method বা introspection) এবং বিষয়গত পদ্ধতি (objective method বা inspection)। প্রথমটি দ্বারা পর্যবেক্ষক স্বীয় মানসিক অবস্থা ও ক্রিয়া পরিদর্শন করিতে পারেন এবং দ্বিতীয়টি দ্বারা অন্বেষকের মনকে জানিবার চেষ্টা করেন। প্রথমটি সাক্ষাৎ-পদ্ধতি (direct method)—ইহা দ্বারা ব্যক্তি-বিশেষ সরাসরি নিজের মনকে জানিতে পারেন; দ্বিতীয়টি গোপন পদ্ধতি (indirect method)—ইহা অনুমান সাপেক্ষ, কারণ অপরের মনের বাহ্য প্রকাশ দর্শন করিয়া ঐ মন সম্বন্ধে অনুমান করা হয়।

২। অন্তর্দর্শন (Introspection) :

(ক) অন্তর্দর্শন কাকে বলে ?

ব্যক্তি-বিশেষ যখন নিজের মনকে নিজে জানে, তখন তাহাকে অন্তর্দর্শন বলে।^২ মনে কোন অবস্থার উদ্ভব হইলেই তাহাকে অন্তর্দর্শন বলে না; কিন্তু ঐ অবস্থা কি করিয়া আসিল, উহার বৈশিষ্ট্য কি অথবা উহা মনের মধ্যে কোন্ কোন্ পরিবর্তন সূচনা করিল ইত্যাদি বিষয় যখন স্পষ্টভাবে চিন্তা করা যায়, তখন তাহাকে অন্তর্দর্শন করা বলে। যেমন, দর্শকেরা ফুটবল খেলা দেখিতেছেন—ইহার অর্থ নহে যে, দর্শকদের অন্তর্দর্শন ঘটিতেছে; কিন্তু কোন দর্শক চিন্তা করিতে পারেন যে, ঐ ফুটবল খেলা দেখিয়া তাঁহার মনে কি কি প্রতিক্রিয়া দেখা দিতেছে—অর্থাৎ কি কি ভাবের উদয় হইতেছে, কিরূপ মানসিক উত্তেজনার মধ্যে তিনি আছেন, তিনি যে পক্ষ সমর্থন করেন, সেই দল গোল করিলে তাঁহার কিরূপ আনন্দ হইতেছে, সেই দলের বিপক্ষে গোল হইলে তাঁহার কিরূপ দুঃখ হইতেছে, গোল করিতে অসমর্থ হইলে তাঁহার কিরূপ নৈরাশ্য জাগিতেছে, ইত্যাদি। এই সকল ব্যাপার যখন তিনি পর্যবেক্ষণ করেন, তখন তিনি অন্তর্দর্শন করিতেছেন বলা যায়।

২ অন্তর্দর্শনের স্বরূপ বুঝিবার জন্ত ইহা কি নহে তাহাও এই প্রসঙ্গে লক্ষ্য করিতে হইবে :

- (১) ইহা নিজের ব্যক্তিগত অতীত জীবনের স্মৃতিস্মরণ (reminiscences) নহে ;
- (২) ইহা নিজের কৃত কোন কার্য সম্বন্ধে ব্যাখ্যা নহে ;
- (৩) ইহা 'আত্মা' নামক কোন অতীন্দ্রিয় সত্তা সম্বন্ধীয় জ্ঞান নহে।

সুতরাং **অন্তর্দর্শন** আত্ম-চেতনার একটা বিশেষ অবস্থা—ইহা স্বীয় মনের প্রতি মনোনিবেশ করা, অর্থাৎ **নিজের মন দ্বারা নিজের মনকে জানা**।

এই আত্ম-চেতনার বিভিন্ন ক্রম বা স্তর আছে। আমরা কোন কিছু সম্বন্ধে সচেতন, কেবলমাত্র এই বিষয় সম্বন্ধে অবহিত হইতে পারি—ইহাই হইল সর্বনিম্ন স্তর। আমরা নিজেদের মানসিক অবস্থা লইয়া যখন চিন্তা করি, তাহা হইল দ্বিতীয় স্তর—ইহা অপেক্ষাকৃত উচ্চপর্যায়ের। আর তৃতীয় বা সর্বোচ্চ স্তর হইল যখন আমরা ব্যক্তিগত মানস অবস্থা সম্বন্ধে জ্ঞানলাভের জন্ত ঐ অবস্থা-সম্বন্ধীয় প্রশ্নের যথাযথ উত্তর দানের চেষ্টা করি। যেমন, মনোবিচার পরীক্ষণাগারে পরীক্ষণ-পাত্রকে (subject of experiment) পরীক্ষক (experimenter) দুইটি বস্তু দেখাইয়া জিজ্ঞাসা করিতে পারেন, “আপনি কি দুইটি বস্তুর প্রতি সমান মনোযোগ দিতেছেন?” অথবা পরীক্ষণ-পাত্রকে তিনি জিজ্ঞাসা করিতে পারেন, “আপনি যখনই চিন্তা করেন, তখনই কি প্রতিরূপ (image)-এর মাধ্যমে চিন্তা করেন?”—এই প্রকার প্রশ্নের উত্তরদানের জন্ত পরীক্ষণ-পাত্র স্বীয় মন অনুধাবন করিয়া যখন স্মৃতিস্তিত উত্তরদানের চেষ্টা করেন, তখন আত্ম-চেতনা স্পষ্ট আকার ধারণ করে।^৩ স্বীয় মনের অবস্থা সম্বন্ধে এইরূপ প্রশ্নের উত্তরদানের জন্ত যেরূপ সূক্ষ্ম পর্যবেক্ষণ আবশ্যিক, সেইরূপ পর্যবেক্ষণের শক্তি ধীরে ধীরে শিক্ষণ ও অভ্যাসের মাধ্যমে আয়ত্ত করিতে হয়।

(খ) **অন্তর্দর্শন সম্বন্ধে বিরুদ্ধ যুক্তি ও উহাদের সমালোচনা :**

উপরের এই আলোচনা হইতে বুঝা যায় যে, **অন্তর্দর্শন** একটি আয়াস-সাধ্য কার্য ; কিন্তু একদল মনোবিৎ **অন্তর্দর্শনের** সম্ভাব্যতা স্বীকার করেন না। **অন্তর্দর্শনের** বিরুদ্ধে তাঁহারা নিম্নলিখিত যুক্তির অবতারণা করেন :

(১) আমাদের মনের সাধারণ ধর্ম হইলে যে, ইহা বহির্মুখী। বাহিরের সামান্য গোলযোগেও আমাদের মন চঞ্চল বা বিক্ষিপ্ত হয়। সেইজন্য আত্মস্থ হইয়া স্বীয় মন পর্যবেক্ষণ করা অসম্ভব হইয়া পড়ে।

ইহার উত্তরে আমরা বলিতে পারি যে, মনের বহির্মুখিতা আমরা অস্বীকার করি না এবং সেইজন্য **অন্তর্দর্শন** যে কঠিন কার্য সে কথাও স্বীকার করি।

কিন্তু এই অস্থবিধা দূর করিবার জন্য অভ্যাস ও শিক্ষণ প্রয়োজন; ইহার ফলে মনের বিক্ষিপ্তভাব ক্রমশঃ দূরীভূত হয়। তাহা ছাড়া, বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে গবেষণাগারে যখন অন্তর্দর্শন করা হয়, তখন বাহ্য-পরিবেশ এমনভাবে নিয়ন্ত্রিত করা হয় যে, মানসিক বিক্ষিপ্ততার স্বযোগ খুবই কমিয়া যায় এবং পরীক্ষণ পাত্রদিগকে উপযুক্ত শিক্ষাদান করিয়া ঐ কার্যের যোগ্য করিয়া তোলা হয়। সুতরাং অন্তর্দর্শন আয়াসসাধ্য কার্য হইলেও উহা অসম্ভব নহে।

(২) অন্তর্দর্শনের বিরুদ্ধে দ্বিতীয় আপত্তি এই যে, কোন মানসিক ক্রিয়া বা অবস্থাকে অন্তর্দর্শন করিলে উহা অন্তর্হিত হইয়া যায়; যেমন, ক্রোধের সময় আমরা যদি অন্তর্দর্শন করিবার চেষ্টা করি, অর্থাৎ তখন যদি ভাবিতে বসি ক্রুদ্ধাবস্থায় আমাদের কিরূপ মানসিক পরিবর্তন ঘটিতেছে, তাহা হইলে ক্রোধের মাত্রা ক্রমশঃই কমিয়া যায়।

এই যুক্তির বিরুদ্ধে আমরা প্রথমতঃ বলিব যে, এই কথা সকল মানসিক অবস্থায় (যথা, সংবেদনের ক্ষেত্রে) খাটে না। আবার সকল অস্থভূতিও অন্তর্দর্শনের ফলে চলিয়া যায় না (যেমন, দাঁতের যন্ত্রণা, মাথার যন্ত্রণা ইত্যাদির উপর মনোনিবেশ করিলে উহারা কমিয়া যায় না)। দ্বিতীয়তঃ, প্রক্ষোভ বা আবেগ প্রশমিত হইলে তৎকালীন মানসিক অবস্থা চিন্তা করা যায়। তৃতীয়তঃ, পরীক্ষণাগারে একটি আবেগকে বার বার জাগরিত করিয়া এক একটি স্তর এক একবার পর্যবেক্ষণ করা যাইতে পারে।^৪

(৩) অন্তর্দর্শনের বিরুদ্ধে ইহাও বলা হয় যে, মনের স্বাভাবিক বৈশিষ্ট্য হইল যে, ইহা সর্বদাই বিষয়ী (subject) বা জ্ঞাতা (knower) এবং সেইজন্য ইহা কখনই বিষয় (object) বা জ্ঞেয় (known) হইতে পারে না। ফরাসী দার্শনিক কোঁৎ (Comte) চক্ষুর উপমা দিয়া বুঝাইয়াছেন যে, প্রতি ব্যক্তিই

৪ অধ্যাপক টিচেনার এই অস্থবিধার প্রতিকারকল্পে বলিয়াছেন : "...the observations in question may be repeated. There is, then, no reason why...in whom the emotion is set up should not report at once upon the first stage of his experience...It is true that this report interrupts the observation. But, after the first stage has been accurately described, further observations may be taken, and the second, third and following stages similarly described; so that presently a complete report upon the whole experience is obtained." (*A Text-book of Psychology*, pp. 22, 23).

নিজের চক্ষুর দ্বারা যেমন অণু বস্তু দর্শন করে, কিন্তু নিজের চক্ষু দেখে না, সেইরূপ প্রতি ব্যক্তিই নিজের মন দ্বারা অণু বস্তু জানিতে পারে, কিন্তু নিজের মনকে জানিতে পারে না।^৫

ইহার উত্তরে বলা যাইতে পারে যে, আমাদের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা হইতে জানি যে, মন কেবলমাত্র জ্ঞানের বিষয় নহে, উহা বিষয়ীও হইতে পারে। আমাদের আত্ম-চেতনা বিশ্লেষণ করিলে ইহা দেখিতে পাই। যেমন, যখন আমি কোন দ্রব্য প্রত্যক্ষ করি, তখন আমি ঐ দ্রব্যকে জানি আবার ইহাও জানি যে, আমিই জানি। এইভাবে আমার “আমি” বিষয়ী ও বিষয় উভয়ই।

(৪) কেহ কেহ ইহাও বলিয়া থাকেন যে, যদিও অন্তর্দর্শন অসম্ভব, তাহা হইলেও স্বীয় মনঃ-সম্বন্ধীয় জ্ঞান একেবারে অসম্ভব নহে। এই জ্ঞান পাওয়া যায়, ‘অতীত-দৃষ্টি’ (retrospection) দ্বারা; অর্থাৎ যখন আমরা ত্রুট হই, তখন অন্তর্দর্শন সম্ভব নহে, তবে ক্রোধ প্রশমিত হইলে অতীতের সেই ত্রুট অবস্থার কথা স্মরণ করিয়া তখন যে সব ‘মানসিক ঘটনা’ ঘটিয়াছিল আমরা সে সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ করিতে পারি।

এই যুক্তি সম্বন্ধে আমরা বলিতে চাই যে, ‘অতীত-দৃষ্টি’ অসম্ভব বা অবাস্তব ইহা আমরা মোটেই বলি না। আমাদের বক্তব্য হইল যে, ‘অন্তর্দর্শন অসম্ভব এবং অতীত-দৃষ্টি ইহার বিকল্প’ (retrospection is a substitute for introspection), এইরূপ কথা বলা যুক্তিযুক্ত নহে। বরং ‘অতীত-দৃষ্টি’ সম্ভব হইতে পারে যদি পূর্বে অন্তর্দর্শন হইয়া থাকে। ‘অতীত-দৃষ্টি’ হইল স্মৃতি-মন্বন এবং কোন বিষয় সম্বন্ধে স্মৃতি তখনই সম্ভব হইতে পারে যখন ঐ বিষয় সম্বন্ধে পূর্বে কোন অভিজ্ঞতা হইয়া থাকে। মনের ক্ষেত্রেও ঐ একই

৫ কোঁতের ভাষায় :

“.....this pretended direct contemplation of the mind by itself is a pure illusion. It is in fact evident that, by an invincible necessity, the human mind can observe directly all phenomena except its own proper states. The thinker cannot divide himself into two, of whom one reasons and the other observes him reason. The organ observed and the organ observing being, in this case, identical, how could observation take place? This pretended psychological method is then radically null and void.” (*Cours de Philosophie Positive*, I).

কথা প্রযোজ্য। স্বীয় মনের অতীত অবস্থা সম্বন্ধে যে স্মৃতি হইতেছে, তাহা হইতেই বুঝা যায় যে, ঐ অবস্থা যখন ঘটিয়াছিল তখন ব্যক্তি-বিশেষ উহা পর্যবেক্ষণ করিয়াছিল। অতীতে ঐ সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ না ঘটিলে বর্তমানে উহার স্মৃতি হইত না এবং বর্তমানে স্মৃতি হইতেছে বলিয়া বুঝা যায় যে, অতীতে উহা প্রত্যক্ষগোচর হইয়াছিল। মানস-অবস্থা সম্বন্ধে ‘অতীত-দৃষ্টি’ই হইল মানস-অবস্থার অন্তর্দর্শনের প্রমাণ।

৩। বাহ্যদর্শন বা বিষয়গত পদ্ধতি (Inspection, Extrospection, Objective method) :

(ক) বাহ্যদর্শন বা বিষয়গত পদ্ধতি কাকে বলে ?

নিজের মনকে জানিলেই মন সম্বন্ধে পর্যাপ্ত জ্ঞান পাওয়া যায় না। অপরের মনকে জানা একান্ত প্রয়োজন। অপরের মনকে সাক্ষাৎভাবে জানা সম্ভব নয়—অপরের মনের প্রকাশের মাধ্যমে অপরের মনকে জানিতে হয়। অতএব এই জ্ঞান অনুমানের ভিত্তিতে গড়িয়া উঠে।

আমরা পরস্পরের নিকট ভাষার মাধ্যমে নিজের মনোভাব ব্যক্ত করি ; সুতরাং অপরের ভাষা শ্রবণ করিয়া এবং তাহার তাৎপর্য বুঝিয়া আমরা অপরের মনকে কিছু পরিমাণে বুঝিতে পারি। কেবল ভাষা নহে, আকার-ইঙ্গিতের দ্বারাও আমরা নিজেদের মনোভাব প্রকাশ করি—যেমন, যন্ত্রণা হইলে আমরা মুখ বিকৃত করি, আবার আনন্দ হইলে আমাদের মুখমণ্ডল একপ্রকার হাস্যমধুর সজীবতা প্রকাশ করে ; কাকেও নীরব হইতে বলিলে নিজেদের মুখের উপর তর্জনী আঙ্গুলটি রাখি ; সন্মতি বা অসন্মতি প্রকাশ করিবার জন্ত নানাভাবে মাথা নাড়ি ; নানারূপ রস-সৃষ্টি করিবার জন্ত কলাবিজ্ঞান-সম্মত বিবিধ মুদ্রা প্রকাশ করিতে পারি—সুতরাং এই সমস্ত ভাবব্যঞ্জনাত্মক আকার-ইঙ্গিত দেখিয়া আমরা অন্তরের মন জানিতে পারি। ইহা ছাড়া, সাহিত্য, কাব্য, চিত্র, ভাস্কর্য-নিদর্শন, স্থাপত্য-নিদর্শন ইত্যাদির মাধ্যমে আমরা বিভিন্ন মনের বিভিন্ন প্রকাশের পরিচয় পাই।

আবার বিভিন্ন স্তরের সমাজ-মন, শিশু-মন, প্রাণি-মন, অস্বভাবি-মন, ইত্যাদি পর্যালোচনার জন্ত বিষয়গত পদ্ধতিই একমাত্র পদ্ধতি।

সমাজ-মনকে জানিতে হইলে সামাজিক আচার-ব্যবহার, সংস্কার, জাতীয় কাহিনী, উপকথা, গাথা ইত্যাদি আলোচনা করিতে হয়। শিশুর মন এবং

মহুশ্চৈতর প্রাণীর মন জানিতে হইলে তাহাদের প্রকাশমান ব্যবহার লক্ষ্য করা এবং শিশু-মন ও প্রাণি-মনের সহিত পরিণতবয়স্কদের মন (adult mind)-এর তুলনা করা প্রয়োজন। সেইরূপ, অস্বভাবি-মন (abnormal mind)-এর প্রকাশের মাধ্যমেই অস্বভাবি-মনকে জানিতে হইবে।

(খ) বিষয়গত পদ্ধতির অসুবিধা :

বিষয়গত পদ্ধতির প্রধান অসুবিধা হইল দুই প্রকার :

(১) পর্যবেক্ষক অপরের মনের প্রকাশগুলি ব্যাখ্যা করিবার সময় ভুল করিতে পারেন। তিনি নিজের আদর্শ, ধারণা, ভাবাবেগ ইত্যাদি অমুসারে অপরের মনকে ব্যাখ্যা করিতে পারেন, অর্থাৎ নিজের মত করিয়া অপরকে ভাবিতে পারেন এবং এখানেই ভুলের সম্ভাবনা দেখা দেয়। যেমন, যিনি নিজে সাধু ও সরল, তিনি অপরের সকল ব্যবহারকেই সাধুভাবের প্রকাশ বলিয়া মনে করেন, আবার অসাধু ব্যক্তি অপরের ব্যবহারকে সর্বদা সন্দেহ করিয়া থাকে।^৬

(২) আবার এরূপও হইতে পারে যে, যাহার মনকে জানিতে হইবে সে নিজের প্রকৃত মনোভাবকে এরূপ স্বকৌশলে গোপন করিতে পারে যে, উহা বুঝা যায় না। যেমন, যে ব্যক্তি পরের সর্বনাশ করিতে যাইতেছে সে এমনভাবে নিজের মনোভাব গোপন করিতে পারে যে, তাহার মনোভাব বুঝা দুঃসাধ্য।

এই দুই অসুবিধা দূর করিবার একমাত্র উপায় হইল স্থানিগত পর্যবেক্ষণ। বারবার বিভিন্ন অবস্থার মধ্যে পর্যবেক্ষণ করাই এই সব ভুল দূরীকরণের একমাত্র উপায়। তাহা ছাড়া, পরীক্ষাগারে কৃত্রিম পরিবেশের মধ্যে একই

৬ এই জন্ত চলতি ভাষায় অনেক সময় বলা হয় : ‘আপনি সাধু, ত’ জগৎ সাধু।’ সেইরূপ সংস্কৃতে বলা হয় : ‘আত্মবৎ মন্ততে জগৎ।’

এই প্রসঙ্গে একটি গল্পের উল্লেখ করা যাইতে পারে। একবার এক কৃপণ পথ চলিতে চলিতে দীর্ঘশ্রুতিবিশিষ্ট একটি লোককে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিল, “আপনার এত বড় দাড়ি কেন? আপনি কি শাল হারাইয়াছেন?” ভদ্রলোক এই প্রশ্নের মর্ম বুঝিতে না পারিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, “দাড়ির সহিত শাল হারানোর কী সম্পর্ক?” কৃপণ তখন ব্যাখ্যা করিয়া বলিল, “আমি একবার গামছা হারাইয়াছিলাম; সাতদিন দাড়ি না কামাইয়া গামছার দাম তুলিবার চেষ্টা করিয়াছিলাম। আপনার যখন এত বড় দাড়ি, তখন নিশ্চয় শাল বা অস্ত্র কোন দামী জিনিস হারাইয়াছেন এবং তাহার দাম উদ্ধারের চেষ্টা করিতেছেন।” যে কৃপণ সে সকলকেই কৃপণ ভাবে!

উদ্দীপক যখন বিভিন্ন ব্যক্তিকে প্রয়োগ করিয়া তাহাদের মানসিক প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করা হয়, তখন এইরূপ ভুলের সম্ভাবনা কমিয়া যায়।

৪। অন্তর্দর্শন ও বিষয়গত-পদ্ধতির পারস্পরিক সহযোগিতা (Mutual Relations of Subjective and Objective Method) :

অন্তর্দর্শন ও বিষয়গত-পদ্ধতি এই দুইটির পারস্পরিক সহযোগিতা ব্যতীত মনোবিজ্ঞান উপযুক্ত উপাত্ত সংগ্রহ করা যায় না।

কেবলমাত্র অন্তর্দর্শনের উপর নির্ভর করিলে মনোবিজ্ঞান বিজ্ঞানের পর্ষায়ে উঠিত না। বিজ্ঞান সর্বজনীন সত্য বা সার্বিক নিয়মের অনুসন্ধান করে; সেইজন্য ব্যক্তি-বিশেষের মনের উপর নির্ভর করিয়া বিজ্ঞান গঠন করা যায় না। যে সব মনোবিং (যথা, ভুণ্ট, টিচেনার ইত্যাদি) অন্তর্দর্শনের পদ্ধতি অবলম্বন করিয়াছিলেন, তাঁহারা কোন একজন ব্যক্তির অন্তর্দর্শন-প্রাপ্ত উপাত্তের উপর নির্ভর করিতেন না—বিভিন্ন ব্যক্তির অন্তর্দর্শন-প্রাপ্ত অভিজ্ঞতা তুলনা করিয়া তাঁহারা মানসরাজ্যের সার্বিক নিয়ম আবিষ্কারের প্রচেষ্টা করিতেন।

আবার কেবলমাত্র বিষয়গত-পদ্ধতি গ্রহণ করিয়াই মনোবিং অগ্রসর হইতে পারেন না। অপরের মনকে বুঝিতে হইলে নিজের মনকে জানা প্রয়োজন। যে নিজে কখনও দুঃখভারে ক্রন্দন করে নাই, সে অপরের ক্রন্দনের পশ্চাতে যে কী ব্যথা আছে তাহা বুঝিবে কি করিয়া? যাহার অন্তর কখনও ভক্তি-রসে আপ্ত হয় নাই, সে ভক্তের আত্ম-নিবেদনের মর্ম কি করিয়া জানিবে?¹

চেষ্টিতবাদী মনোবিদগণ (Behaviorists) মনকে অস্বীকার করেন বলিয়া অন্তর্দর্শনে তাঁহারা একেবারেই আস্থাবান্ নহেন। মনকে অস্বীকার

১ কবির ভাষায় :

“চিরস্থায়ী জন ভ্রমে কি কখন
ব্যথিত বেদন বুঝিতে পারে?”

সেইরূপ ডঃ মার্টিনো (Dr. Martineau) মন্তব্য করিয়াছেন : “Without susceptibility to love, how stupidly should we stare at the kiss of the mother to the child! Without openness to sorrow, at the prostrate and sobbing mourner! Without sense of religion, at the clasped hands of prayer!” (*Types of Ethical Theory*, Vol. II, 30).

সুতরাং এই হিসাবে মনোবিজ্ঞান ক্ষেত্রেও ‘আত্মানং বিজি’ এই বাণী প্রযোজ্য। (অবশ্য এইখানে ‘আত্মা’ পদটি অতীন্দ্রিয় সত্তা হিসাবে গ্রহণ করিতে হইবে না)।

করিয়া মনোবিজ্ঞা গঠনের তাঁহাদের এই প্রচেষ্টা যে গ্রহণযোগ্য নহে তাহা আমরা পূর্বেই বলিয়াছি।^৮

সুতরাং পরিশেষে আমরা বলিব যে, **অন্তর্দর্শন ও বাহ্যদর্শন এই দুইটি পদ্ধতির একটিকে বাদ দিয়া মনোবিজ্ঞা গঠনের প্রচেষ্টা সমীচীন নহে।**

এই প্রসঙ্গে আর একটি কথা স্মরণ রাখিতে হইবে। আমরা উপরে বলিলাম যে, স্বীয় মন সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ করিলে তাহারই উপমায় পরের মন জানিতে পারি। ইহার অর্থ এইরূপ নহে যে, সর্বদাই আমরা প্রথমে নিজ মন সম্বন্ধে চিন্তা করিয়া থাকি। অনেক সময় অল্প লোকের প্রশ্নে বা সমালোচনায় আমরা আত্ম-সচেতন হইয়া উঠি এবং তখন নিজের মন সম্বন্ধে চিন্তা করিতে সুরু করি। অনেকক্ষেত্রে এইরূপ হয় যে, অল্প লোকে যদি প্রশ্ন করে ‘তুমি আজ এত উল্লসিত কেন?’ বা ‘তুমি আজ এত বিমর্ষ কেন?’, তখন আমরা ভাবিয়া দেখি সত্যি ঐরূপ কোন অনুভূতি আমাদের অন্তরে জাগিতেছে কি না। শৈশবে এইরূপ প্রশ্নের ফলেই শিশু ক্রমশঃ নিজের সম্বন্ধে ভাবিতে শেখে।

৫। পরীক্ষণ-পদ্ধতি (Experimental Method) :

বিজ্ঞান যথার্থ ও বস্তুনিষ্ঠ জ্ঞানদানের চেষ্টা করে এবং পরীক্ষণের মাধ্যমে যে জ্ঞানলাভ করা যায় তাহার সত্যতা বা যথার্থ্য সম্বন্ধে আমরা বহুল পরিমাণে সুনিশ্চিত হইতে পারি। এইজন্য বর্তমানকালে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি মাত্রই পরীক্ষণমূলক হইয়া দাঁড়াইয়াছে।^৯ মনোবিজ্ঞার ক্ষেত্রেও ইহার ব্যতিক্রম নাই।

(ক) পরীক্ষণের সুবিধা :

পরীক্ষণ বলিতে আমরা বুঝি **সুনিয়ন্ত্রিতভাবে সৃষ্ট কৃত্রিম অবস্থার মধ্যে সুনিপুণ পর্যবেক্ষণ।** পরীক্ষণের সুবিধা হইল যে, সমস্ত অবস্থা পরীক্ষকের আয়ত্তাধীন থাকার জন্য পরীক্ষক প্রয়োজনমত অবস্থার মধ্যে পরিবর্তন আনিতে পারেন এবং এই পরিবর্তন ঠিক কি প্রকারের বা কি পরিমাণের হইতেছে সে সম্বন্ধে তিনি সম্পূর্ণরূপে জ্ঞাত থাকেন। আবার

^৮ পৃ: ১৫-১৮ দ্রষ্টব্য।

^৯ F. W. Westaway-রচিত *Scientific Method* দ্রষ্টব্য।

পরীক্ষণ প্রয়োজনমত ব্যবহার করা যাইতে পারে এবং উহা আমাদের সময়, স্বযোগ এবং উদ্দেশ্য অনুযায়ী করা যাইতে পারে।

(খ) পরীক্ষণ-প্রক্রিয়া :

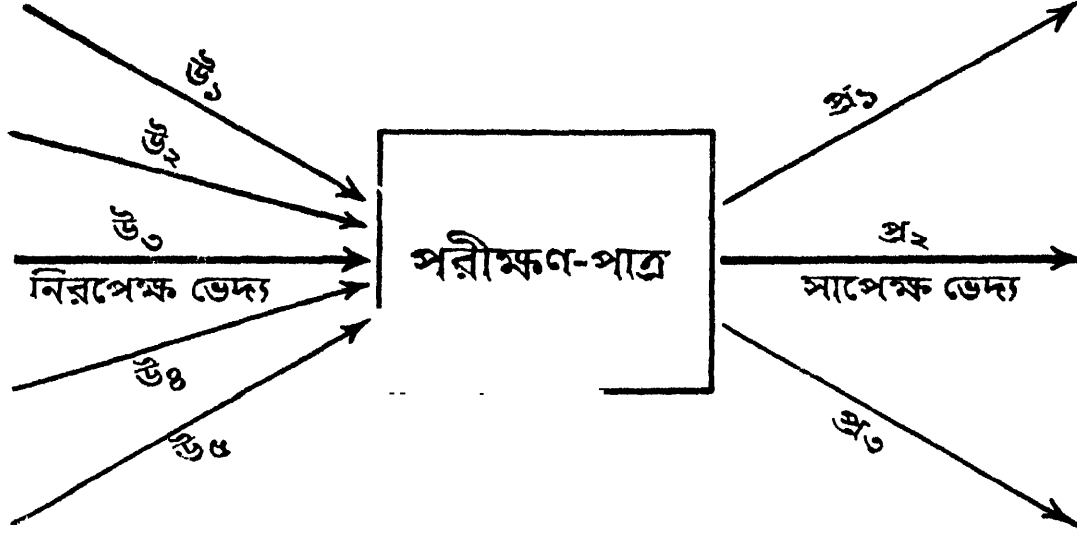
পরীক্ষণ-পদ্ধতির একটি সাধারণ নিয়ম হইল পূর্ববর্তী অবস্থাগুলির মধ্যে মাত্র একটির পরিবর্তন ঘটাইয়া দেখা হয় অনুবর্তী অবস্থার মধ্যে কী পরিবর্তন সৃচিত হইতেছে।^{১০} পরীক্ষণ-পাত্রে পরীক্ষার জন্য যে কৃত্রিম পরিবেশের সৃষ্টি করা হয় তাহাদের মধ্যে কতকগুলি ঘটনা পরিবর্তনশীল আর কতকগুলি অপরিবর্তনশীল। যে সব ঘটনা পরিবর্তনশীল তাহাদের বলা হয় ভেদ্য (variable)—এই ভেদ্য নিরপেক্ষ (independent) অথবা সাপেক্ষ (dependent) হইতে পারে। নিরপেক্ষ ভেদ্যের পরিবর্তন ঘটিলে সাপেক্ষ ভেদ্যের পরিবর্তন ঘটিবে।

মনে করা যাউক ‘ক’ একজন পরীক্ষণ-পাত্র। ‘ক’-কে এমন এক পরিবেশের মধ্যে রাখা হইল যে, তাহার উপর বিভিন্ন উদ্দীপক ক্রিয়া করিতেছে; এই সব উদ্দীপকের মধ্যে একটি হইল পরীক্ষণ-পাত্রের উপর যেটির প্রভাব পরীক্ষক লক্ষ্য করিতে চাহেন সেইটি। এই বিশেষ উদ্দীপকটি হইল নিরপেক্ষ ভেদ্য—ইহারই পরিবর্তন সাধন করিয়া পরীক্ষণ-পাত্রের প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করা হয়। উদ্দীপকের পরিবর্তনের সহিত প্রতিক্রিয়ারও পরিবর্তন ঘটিতে থাকিবে। অন্যান্য পূর্ববর্তী ঘটনাগুলি যদি অপরিবর্তিত থাকে, তাহা হইলে পূর্ববর্তী পরিবর্তনশীল ঘটনার সহিত অনুবর্তী পরিবর্তনশীল ঘটনার সম্বন্ধ স্থাপিত হইবে।

পরপৃষ্ঠায় প্রদত্ত চিত্রে দেখা যাইতেছে যে, পরীক্ষণ-পাত্রের উপর যে সমস্ত উদ্দীপক কার্য করিতেছে, তাহাদের ভিতর U_1 , U_2 , U_8 , এবং U_6 অভেদ্য ও অপরিবর্তনীয় (constant)। পরীক্ষক U_3 প্রয়োগ করিলেন এবং

১০. তুলনীয়: “The fundamental requirement of the experimental method is that all the factors which produce a given result be held constant, except the one whose effects you are examining. Otherwise it is impossible to tell what influence this one factor has on the situation.” (F. L. Ruch, *Psychology and Life*, p. 30).

তাহার ফলে 'প্র_২' প্রতিক্রিয়া দেখা দিল। যেহেতু প্র_২ হইল উ_৩-এর উপর নির্ভরশীল, সেইহেতু প্র_২ হইল সাপেক্ষ ভেদ্য।



পরীক্ষণ-পদ্ধতি অন্তর্দর্শন ও বাহ্যদর্শন উভয়ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা যায়। উপরের উদাহরণে পরীক্ষক যদি কেবলমাত্র বাহ্য প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করেন, তাহা হইলে পরীক্ষক বিষয়গত-পদ্ধতি অনুধাবন করিতেছেন বলা যায়; আর তিনি যদি পরীক্ষণ-পাত্রকে প্রশ্ন করেন যে, ঐ প্রতিক্রিয়ার সময় তাহার মনে কি কি পরিবর্তন হইতেছে এবং পরীক্ষণ-পাত্র যদি তাহা জানিতে চেষ্টা করেন, তাহা হইলে উহা হইবে পরীক্ষণের ভিত্তিতে অন্তর্দর্শন।

(গ) পরীক্ষণের অসুবিধা :

আমরা উপরে পরীক্ষণের সুবিধার কথা উল্লেখ করিয়াছি। আজ বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে কিন্তু সর্বত্র পরীক্ষণের ব্যবহার হইলেও মনোবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে ইহার প্রয়োগ সম্বন্ধে বিরুদ্ধ সমালোচনাও হইয়াছে।

(১) পরীক্ষণ-পদ্ধতির বিরুদ্ধে একটি প্রধান আপত্তি হইল যে, ইহার দ্বারা নিত্যস্থ কৃত্রিম অবস্থার মধ্যে পরীক্ষা চালান হইয়া থাকে। এই কৃত্রিম বা অস্বাভাবিক অবস্থার মধ্যে পরীক্ষণ-পাত্র নিজের 'স্বাভাবিক' ব্যবহার দেখাইতে পারে না।

ইহার উত্তরে বলা যায় যে, একেবারে স্বাভাবিক অবস্থার মধ্যে কোন পরীক্ষণই চালান সম্ভব নয়। তবে অভিজ্ঞ পরীক্ষক পরীক্ষণাগারের অবস্থার

সহিত বাস্তবজগতের তথাকথিত স্বাভাবিক অবস্থার যথাসম্ভব সমতা-বিধানের চেষ্টা করেন।^{১১}

(২) পরীক্ষণ-পদ্ধতির আদর্শ হইল মাত্র একটি পূর্ববর্তী অবস্থার মধ্যে পরিবর্তন আনিয়া উহার প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করা। সজীব প্রাণীর ক্ষেত্রে, বিশেষতঃ জটিল মনুষ্য-মনের ক্ষেত্রে, এইরূপ আদর্শ অবস্থার সৃষ্টি করা এক প্রকার অসম্ভব।^{১২}

যে কোন জীবের ব্যবহার পর্যবেক্ষণ কালেই এই অসুবিধা দেখা দিবে। এই অসুবিধা কিয়ৎ-পরিমাণে দূর করা যায় যদি বিভিন্ন অবস্থার মধ্যে একই উদ্দীপক (যাহাকে ‘নিরপেক্ষ ভেতু’ বলা হইয়া থাকে) প্রয়োগ করা যায়।

(৩) মনোবিজ্ঞান ক্ষেত্রে আর একটি অসুবিধা হইল যে, ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে পার্থক্য থাকার জন্ত একজন বিশেষ ব্যক্তিকে পরীক্ষা করিয়া কোন বিষয়ে হির সিদ্ধান্ত করা যায় না। পদার্থবিজ্ঞান বা অনুরূপ বিজ্ঞানে একটি পরীক্ষণ যথাযথ করিলে তাহার ভিত্তিতে একটি সার্বিক বচন করিলেও করা যাইতে পারে। মনোবিজ্ঞান ক্ষেত্রে কিন্তু এইরূপ করিবার সুবিধা নাই।

এইজন্য প্রয়োজন বিভিন্ন ব্যক্তির উপর একই প্রকারের উদ্দীপক প্রয়োগ করিয়া তাহার প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করা।

(৪) মনোবিজ্ঞান ক্ষেত্রে পরীক্ষণের বিষয়বস্তু এত বিভিন্ন প্রকারের হইতে পারে এবং পরীক্ষণ-পাত্রও এত বিভিন্ন প্রকারের ব্যক্তিত্ব-সম্পন্ন হইতে পারে

১১ এই প্রসঙ্গে বলা যাইতে পারে যে, পদার্থবিজ্ঞান (Physics) জ্ঞায় বস্তুনিষ্ঠ বিজ্ঞানও সকল ক্ষেত্রে “স্বাভাবিক” অবস্থার মধ্যে সকল পরীক্ষণ করিতে পারে না। উদাহরণ-স্বরূপ উডওয়ার্থ বলিয়াছেন যে, জড়পদার্থের পতন-সংক্রান্ত নিয়ম (law of falling bodies) নির্ধারণের জন্ত বিভিন্ন পরিমাণের জড়পদার্থ লইয়া সম্পূর্ণ শূন্যস্থানে (vacuum) পরীক্ষণ চালান হইয়া থাকে; কিন্তু প্রকৃতিতে কি ‘সম্পূর্ণ শূন্যস্থান’ বলিয়া কিছু থাকে? (Woodworth, ‘Successes and failures of experimental psychology’-দীর্ঘক প্রবন্ধ, *Science* 1941)। বাস্তবিক পরীক্ষণমাত্রই অল্পবিস্তর ‘কৃত্রিম’ হইবে—পরীক্ষণের সংজ্ঞাই হইল কৃত্রিম অবস্থার মধ্যে পর্যবেক্ষণ।

১২ Ruch বলেন: “The ideal of experimental method can never be completely attained in the social sciences. Psychology can never expect the precision of physics or chemistry, which do not study living organisms.” (*Psychology and Life*, p. 30).

যে, সকল ক্ষেত্রে পরীক্ষণ পদ্ধতি যথাযথ প্রয়োগ করা যায় না। পরীক্ষণ-পদ্ধতির দ্বারা প্রক্ষোভ ও অনুরূপতার বিষয়গত পর্যবেক্ষণ করার একটি প্রধান অসুবিধা হইল প্রয়োজনমত কৃত্রিম উপায়ে আবেগাদি সৃষ্টি করা যায় না। যেমন, অনুরোধ করা মাত্র রাগা বা হাস্য সম্ভব নয়। সেইরূপ শিক্ষণ (learning), বর্ধন (growth) ইত্যাদি ক্ষেত্রেও পরীক্ষণ-পদ্ধতি প্রয়োগের নানা অসুবিধা আছে। আবার অনেকক্ষেত্রে সামাজিক পরিবেশ হইতে বিচ্ছিন্নভাবে মানুষকে পরীক্ষা করিলে তাহার প্রকৃত ব্যক্তিত্বের পরিচয় পাওয়া যায় না।

এই সব তথাকথিত অসুবিধা মনোবিজ্ঞান ক্ষেত্রে থাকিয়া যাইবেই; কারণ মনোবিজ্ঞান পরীক্ষণ-পাত্র হইল স্বচ্ছাশক্তিসম্পন্ন মনোবিশিষ্ট ক্রিয়াশীল মানুষ—পদার্থবিজ্ঞান গ্রন্থ ইহা অচেতন পদার্থ লইয়া আলোচনা করে না। এই জন্য মনোবিজ্ঞান ক্ষেত্রে বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গী হইতে সতর্কভাবে পরীক্ষণ-পদ্ধতি চালাইতে হইবে।^{১৩}

৬। অন্যান্য কয়েকটি পদ্ধতি (Other Methods) :

আমরা পূর্বেই বলিয়াছি যে, সজীব সক্রিয় মনকে বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গী হইতে আলোচনা করা যাইতে পারে। এই কারণে আলোচ্য বিষয়বস্তু এবং আলোচনার উদ্দেশ্যের পার্থক্য অনুসারে মনোবিজ্ঞান বিভিন্ন পদ্ধতি গ্রহণ করা যায়। আমরা বর্তমান অনুচ্ছেদে এইরূপ আরও কয়েকটি পদ্ধতির আলোচনা করিব।

(ক) উৎপত্তি-সম্বন্ধীয় পদ্ধতি বা জনি-পদ্ধতি (Genetic Method) :

অন্যান্য সকল প্রাণীর গ্রন্থ মানুষও ক্রমবিকাশশীল। তাহার দেহ ও মন ধীরে ধীরে পরিবর্তনের মাধ্যমে পরিপকতার পথে অগ্রসর হয়। এক একটি বিশেষ বিশেষ স্তর বা পর্যায়ে তাহার মানসিক বৈশিষ্ট্য এক এক প্রকারের থাকে। সুতরাং মানুষকে জানিতে হইলে তাহার ক্রমবিবর্তনের দ্বারা জানা একান্ত প্রয়োজন। সেইসঙ্গে ইহাও জানিতে

১৩। মনোবিজ্ঞান পরীক্ষণ-পদ্ধতির প্রয়োগের সুবিধা-অসুবিধা সম্বন্ধে T. G. Andrews-সম্পাদিত *Methods of Psychology*, ১ম অধ্যায়, দ্রষ্টব্য।

হইবে যে, মনুষ্যমনের এই বিবর্তনের মূলে বংশপ্রভাব (*heredity*) ও বাহ্য-পরিবেশ (*environment*)-এর প্রভাব কি প্রকার ও কতদূর। মনোবিজ্ঞান ক্ষেত্রে উৎপত্তি-সম্বন্ধীয় পদ্ধতি প্রয়োগ দ্বারা মনোবিৎ মানসিক ধারা (অর্থাৎ এক একটি বিশেষ পর্যায়ের বৈশিষ্ট্য ও কারণ এবং উহার পূর্ববর্তী ও পরবর্তী পর্যায়ের সহিত সম্বন্ধ) বিষয়ে উপাত্ত সংগ্রহের চেষ্টা করেন।^{১৪}

এই পদ্ধতির যদি পূর্ণ প্রয়োগ করিতে হয়, তাহা হইলে ব্যক্তি-বিশেষকে আশৈশব পর্যবেক্ষণ করা উচিত। এরূপ সন্ধান সব সময় লাভ করা যায় না। তাহা ছাড়া, মানব-শিশুর ক্ষেত্রে কোন অনিষ্টকর পরিবেশ বা তদনুরূপ অথবা কোন অনিষ্টকর বিষয়ের প্রভাব লইয়া পরীক্ষণ বিপজ্জনক।^{১৫}

এই পদ্ধতির সাহায্যে যে সব বিষয় সম্বন্ধে উপাত্ত সংগ্রহের চেষ্টা করা হয়, তাহাদের কয়েকটির এখানে উল্লেখ করা যাইতে পারে :

(১) কোন জাতির জাতীয় মনের পরিবর্তন ও বিবর্তন কি করিয়া ঘটয়াছে ;

(২) ব্যক্তি-বিশেষের দেহ-মনের পরিবর্তন শৈশব হইতে কৈশোর এবং কৈশোর হইতে যৌবন পর্যন্ত কি ভাবে ঘটে ;

(৩) কোন শিশুর মনে বিভিন্ন প্রত্যয় (*general concepts or ideas*) কিভাবে জন্মে ;

[পরীক্ষণমূলকভাবে কোন একটি বিশেষ প্রত্যয় লইয়া পর্যবেক্ষণ করা যাইতে পারে—যেমন, শিশুর মনে অহং-জ্ঞান (*notion of self*), বাহ্য-জগৎ সম্বন্ধে জ্ঞান (*notion of the external world*), স্থান ও কাল সম্বন্ধে ধারণা (*notion of space and time*) ইত্যাদি কিভাবে ধীরে ধীরে সূক্ষ্মপটু রূপ ধারণ করে সে সম্বন্ধে আলোচনা করা যাইতে পারে।]

(৪) শিশু-মনে আবেগ, অনুভূতি কিভাবে ধীরে ধীরে প্রকাশ লাভ করে এবং কিভাবে শিশু সেইগুলি সামাজিক আদর্শের মাপকাঠিতে সূনিয়ন্ত্রিত করিতে শিখে ;

১৪ কেহ কেহ এই পদ্ধতিকে বর্ধন-সম্বন্ধীয় পদ্ধতি (*Developmental method*) বলেন।

১৫ এইরূপ ক্ষেত্রে মনোবিৎ মনুষ্যের প্রাণী লইয়া পরীক্ষণ চালাইয়া থাকেন।

- (৫) শিশু-জীবনকে সহজ-প্রবৃত্তি কিভাবে প্রভাবিত করে ;
- (৬) সাধারণভাবে বুদ্ধির বিকাশ, শিক্ষণ-শক্তির বিকাশ, ব্যক্তিত্বের বিকাশ ইত্যাদি কিভাবে ঘটে ;
- (৭) কৈশোর ও যৌবন-সন্ধিক্ষণে সমগ্র ব্যক্তিত্বের কি পরিবর্তন দেখা দেয়। (পৃঃ ৫৭ দ্রষ্টব্য)।

(খ) রোগি-পরীক্ষা পদ্ধতি (Clinical^{১৬} Method) :

মানুষ সর্বদাই তাহার পরিবেশের সহিত প্রতিযোজন ও উপযোজনের প্রচেষ্টা করে ; কিন্তু সকলক্ষেত্রেই সে সূষ্ঠভাবে এই কার্য করিতে পারে না— অর্থাৎ পরিবেশের সহিত সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া চলিতে পারে না। এইসব ক্ষেত্রে মানসিক রোগ বা বিকার দেখা দিতে পারে। রোগি-পরীক্ষা পদ্ধতি দ্বারা এই বিষয়ে উপাত্ত সংগ্রহ করিয়া মনোবিদগণ মানসিক রোগ বা বিকারের কারণ এবং তাহা দূরীকরণের চেষ্টা করিয়া থাকেন।

মানসিক রোগ বা বিকার পদটি মনোবিদ্যায় ব্যাপক অর্থে প্রয়োগ করা হয়। যে কোন প্রকারের অপ-প্রতিযোজন (mal-adaptation) ও অপ-উপযোজন (mal-adjustment) হইতে বাহ্য-ব্যবহারে যে অসামঞ্জস্য দেখা দেয়, তাহাকেই মানসিক বিকার বা রোগ বা অস্বভাবি-মনের^{১৭} লক্ষণ বলা যাইতে পারে।

রোগি-পরীক্ষা পদ্ধতির প্রয়োগক্ষেত্র যে কত ব্যাপক তাহা ইহার দ্বারা অনুসন্ধান বিষয়বস্তুর তালিকা পর্যালোচনা করিলে বুঝা যাইবে। আমরা উদাহরণস্বরূপ কয়েকটি বিষয়ের উল্লেখ করিতে পারি :

অস্থিরতা, স্নায়ু-দৌর্বল্য, উত্তেজনা-প্রবণতা, অবাধ্যতা, ঔদ্ধত্য, দুর্বল-চিন্তা, বুদ্ধি-দৌর্বল্য, নিবুদ্ধিতা, উৎসাহের অভাব, চৌর্ধ-প্রবণতা, মিথ্যা-ভাষণের চেষ্টা, কলহপরায়ণতা, হস্তমৈথুন, স্কুল হইতে পলায়ন, গৃহ হইতে

^{১৬} ইংরাজী Clinical পদটি গ্রীক *Klinikos*, অর্থাৎ ‘শয্যা’ পদ হইতে ইহা আছে। ইহার সাধারণ অর্থ দাঁড়াইয়াছে ‘রোগ-সম্বন্ধীয়’। মনোবিদ্যায় আবার ইহা বিশেষ অর্থে প্রযুক্ত হয়। American Psychological Association-এর Clinical Section ‘Clinical Psychology’-র সংজ্ঞা দিয়াছেন : ‘The term Clinical Psychology should be used to denote that art and technology which deals with the adjustment problems of human beings.’

^{১৭} ৩য় অধ্যায়, ৬ষ্ঠ অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য।

পলায়ন, শিক্ষায় উন্নতির অভাব, অতিরিক্ত লজ্জাশীলতা, কৈশোর ও যৌবনেও শিশুসুলভ মনোবৃত্তি, অন্ধ, বধির ইত্যাদির শিক্ষণ-সমস্যা, বাকশক্তির অপটুতা, উদ্বায়, বাতুলতা প্রভৃতি বিশেষ বিশেষ মানসিক রোগ।

(গ) ঘটনা-বিবরণ পদ্ধতি (Case History Method) :

এই পদ্ধতির লক্ষ্য হইল কোন ঘটনার ইতিহাস পর্যালোচনা করা। এই পদ্ধতি দ্বারা চেষ্টা করা হয় কোন বিশেষ মানসিক ঘটনার প্রয়োজনীয় বিবরণী সংগ্রহ করা। মনের কোন বর্তমান অবস্থা স্মৃতিভাবে জানিতে হইলে উহাকে অতীত হইতে বিচ্ছিন্নভাবে দেখা যায় না। সেই কারণে অতীতকে জানা প্রয়োজন এবং অতীতের ইতিহাস জানাই হইল ঘটনা-বিবরণ পদ্ধতির লক্ষ্য।

এই পদ্ধতি অনেক সময়ই উৎপত্তি-সম্বন্ধীয় পদ্ধতি অথবা রোগী-পরীক্ষণ পদ্ধতির সহকারী পদ্ধতি হিসাবে ব্যবহার করা হয়। যেমন, উৎপত্তি-সম্বন্ধীয় পদ্ধতির সাহায্যে যখন ব্যক্তি-বিশেষের মনের কোন এক পর্যায়ের পরিবর্তন সম্বন্ধে অনুসন্ধান করা হয়, তখন পূর্ববর্তী পর্যায়ের ক্রম-বিকাশের ইতিহাস জানিবার জন্য ঘটনা-বিবরণ-পদ্ধতি অবলম্বন করা হয়। সেইরূপ অস্বাভাবিক-মন বা রোগি-মন সম্বন্ধে রোগি-পরীক্ষা পদ্ধতি দ্বারা অনুসন্ধানকালে রোগীর পূর্বকালীন অবস্থা বা তাহার বংশের ইতিহাস জানা আবশ্যক হয়, এবং এই কারণে ঘটনা-বিবরণ পদ্ধতির প্রয়োগ করা হয়।

এই পদ্ধতি প্রয়োগকালে মনোবিৎকে বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করিতে হয়, কারণ প্রকৃত ইতিহাসের সহিত কাল্পনিক কাহিনী মিশাইয়া ফেলিবার যথেষ্ট সম্ভাবনা থাকে। তাহা ছাড়া, প্রয়োজন অনুসারে মনোবিৎকে অতীত ইতিহাসের এক বিশেষ বিশেষ পর্যায়ের উপর গুরুত্ব আরোপ করিতে হয়।

(ঘ) বিশ্লেষণ-পদ্ধতি (Analytic Method) :

এই পদ্ধতি অনুসারে মনোবিৎ জটিল মানসিক অবস্থা ও ক্রিয়াকে বৃষ্টিবার স্তবিধার জন্য উহাদের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সরল 'উপাদানে' ভাগ করেন (পৃ: ১৫)। তথাকথিত সরল উপাদানগুলির শ্রেণীকরণ করা হয় এবং তাহাদের সমন্বয়ের সাধারণ সূত্র আবিষ্কারের চেষ্টা করা হয়।

তৃতীয় অধ্যায়

মনোবিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখা

মনোবিজ্ঞানের প্রসার ও উন্নতির ফলে বিভিন্ন ক্ষেত্রে ইহার প্রয়োগ ঘটিতেছে এবং ইহার শাখাপ্রশাখা সূদূরপ্রসারী হইয়াছে। বর্তমান অধ্যায়ে আমরা কয়েকটি শাখার আলোচনা করিব।

১। প্রাণি-মনোবিদ্যা (Animal Psychology) :

(ক) বিষয়বস্তু :

প্রাণি-মনোবিজ্ঞানের আলোচ্য বিষয় হইল মনুষ্যোত্তর প্রাণীর মনের বিভিন্ন প্রকাশ। মনুষ্যোত্তর প্রাণী বলিতে আমরা এককোষ-বিশিষ্ট ক্ষুদ্রাতি-ক্ষুদ্র জীব হইতে আরম্ভ করিয়া মৃষিক, বিড়াল, কুকুর, অশ্ব, হস্তী, বানর ইত্যাদি উচ্চপৰ্যায়ের সমস্ত জীবকে বুঝি।^১

প্রাণি-মনোবিজ্ঞানের বিষয়বস্তু মোটামুটি চারি ভাগে ভাগ করা যায়^২ :

(১) বিশেষ বিশেষ প্রাণীর—যথা, মৃষিক, কুকুর, বানর ইত্যাদির—বাহ্য-প্রকাশগুলি আলোচনা ;

(২) তুলনামূলক আলোচনা, অর্থাৎ এক জীবের ব্যবহারের সহিত অপর জীবের ব্যবহারের তুলনা ;

(৩) জীব-জগতের বিবর্তনের আলোচনা (phylogenetic studies), অর্থাৎ ক্ষুদ্র এককোষ-বিশিষ্ট জীবের যদি চেতনা থাকে তাহা হইতে উচ্চতর পর্যায়ের জটিল অবস্থার উদ্ভব কিরূপে হইয়াছে তাহা অনুসন্ধান করা ;

(৪) গবেষণার মাধ্যম (research tool) নিরূপণ ও পর্যবেক্ষণ, অর্থাৎ কোন বিশেষ প্রকারের প্রাণীকে আদর্শদৃষ্টান্ত বা নমুনা (typical example

১ এখানে ‘প্রাণী’ শব্দটি সঙ্কীর্ণ অর্থে ব্যবহার করা হইয়াছে। প্রাণি-মনোবিজ্ঞান বৃক্ষাদির কোন আলোচনা করা হয় না, আবার মনুষ্য-মনেরও আলোচনা নাই। (তবে মনুষ্য-মনের সহিত ইতর জীবের মনের তুলনা করা বাইতে পারে।)

২ N. L. Munn-রচিত *Handbook of Psychological Research on the Rat* দ্রষ্টব্য।

বা specimen) হিসাবে গ্রহণ করিয়া তাহার সাহায্যে সাধারণ-মনোবিজ্ঞান (general psychology) বিভিন্ন সমস্যা আলোচনা ।^৩

মনোবিজ্ঞান নিজেই তরুণ বিজ্ঞান ; সুতরাং প্রাণি-মনোবিজ্ঞান যে নিতান্তই তরুণ বিজ্ঞান হইবে তাহা আশ্চর্য নহে । প্রাণি-মনোবিজ্ঞান মূল সমস্যাগুলি এখনও অসীমসীমিত রহিয়াছে এবং গবেষণার ক্ষেত্র এখনও নিতান্ত সঙ্কীর্ণ ।

(খ) পর্যবেক্ষণ-পদ্ধতি :

প্রাণি-মনো আলোচনাকালে আমাদের সম্পূর্ণরূপে বিষয়গত-পদ্ধতি (objective method)-এর উপর নির্ভর করিতে হয় । ইহার একটি অঙ্গবিধা হইতেছে যে, এ ব্যাপারে যাহাদের মন লইয়া আলোচনা করি তাহাদের সহিত কথোপকথন করিয়া আমাদের অনুমানের সত্যাসত্য নির্ধারণ করিতে পারি না । আবার বিষয়গত-পদ্ধতির কিভাবে প্রয়োগ হইবে তাহা লইয়াও মতভেদ আছে :

(১) উপকথা-পদ্ধতি (Anecdotal Method)—সাধারণ লোকে বিভিন্ন মনুষ্যের জীবের যে সব কাহিনী বর্ণনা করে, তাহার ভিত্তিতে প্রাণি-মনো আলোচনা করা হয় । বিশেষ কোন বৈশিষ্ট্যের জন্য যখন কোন জীবের ব্যবহার আমাদের দৃষ্টিগোচর হয়, তখন সাধারণতঃ আমরা উহা অন্তর নিকট বর্ণনা করিয়া থাকি এবং ঐ ভাবেই বিভিন্ন কাহিনী প্রচারিত হইয়া থাকে । রোমানেন্স (Romanes)-রচিত 'Animal Intelligence'-শীর্ষক পুস্তকখানির কথা উদাহরণস্বরূপ বলা যাইতে পারে ।

এই প্রকারের পদ্ধতির বিরুদ্ধে আপত্তি হইল যে, যে সব লোকের কাহিনীর উপর ভিত্তি করিয়া প্রাণি-মনোবিজ্ঞান রচিত হইবে, তাহাদের বৈজ্ঞানিক শিক্ষা

৩ প্রাণি-মনো গবেষণার মাধ্যম হিসাবে কোন জীবের মন সবিস্তারে আলোচনা করা কর্তব্য সে বিষয়ে যথেষ্ট মতভেদ আছে । উদাহরণস্বরূপ বলা যাইতে পারে যে, মুন (Munn)-এর মতে ইঁদুর বা মূষিকের ব্যবহারকে জীবের ব্যবহার পর্যালোচনার আদর্শ হিসাবে গ্রহণ করা যাইতে পারে । তিনি বলেন : "Indeed it can be said that material on the rat now covers every important area of psychological research." (*Hand-book of Psychological Research on the Rat*, p. viii) । অনেকে এই প্রণালীর সমালোচনা করিয়া বলিয়াছেন যে, Munn ইত্যাদি পিণ্ডরক্ষক মূষিক পর্যবেক্ষণ করিয়া কিরূপে প্রাণি-মনো স্বাভাবিক ব্যবহার আলোচনা করিতে পারেন তাহা বোধগম্য নহে । (দ্রষ্টব্য : R. Christie, 'Experimental naivete' and 'experiential naivete', *Psychological Bulletin*, 1951, Vol. 48, p. 338).

নাই ; তাঁহারা অনেক সময় সত্যের সহিত কল্পনা মিশাইয়া ফেলেন—বিশেষতঃ যদি নিজের পোষা পশুপক্ষী সম্বন্ধে কিছু বলিতে হয়, তাহা হইলে উহাদের ‘কৃতিত্ব’ প্রকাশের জন্ত তাঁহারা এমন অনেক কথা বলিয়া ফেলেন যাহা সত্য নহে, অর্থাৎ তাঁহাদের বর্ণনা পক্ষপাতিত্ব-দোষে দুষ্ট হইয়া পড়ে ।

(২) পরীক্ষণ-পদ্ধতি (The Method of Experiment)—উপকথা-পদ্ধতির ঠিক বিপরীত হইল পরীক্ষণ-পদ্ধতি । পরীক্ষণকারী কৃত্রিম উপায়ে এমন একটা পরিবেশের সৃষ্টি করেন যাহার মধ্যে জীবেরা নিজেদের ব্যবহার প্রকাশ করিতে পারে । এই কৃত্রিম পরিবেশ এমনভাবে সৃষ্টি করিতে হইবে যে, ইহা যেন জীবের কোন স্বাভাবিক প্রবৃত্তির মূলে সাড়া জাগাইতে পারে ।

এই প্রক্রিয়ার সুবিধা হইল যে, ইহা পক্ষপাতিত্বহীন বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী হইতে পরিচালিত হয় । আর ইহার অসুবিধা হইল যে, কৃত্রিম উপায়ে যে পরিবেশের সৃষ্টি করা হয়, তাহা সম্পূর্ণরূপে সাধারণ প্রাকৃতিক পরিবেশের তুল্য হইতে পারে না—ফলে পরীক্ষিত জীবের সম্পূর্ণরূপে স্বাভাবিক ব্যবহার পর্যবেক্ষণ করা যায় না ।

(৩) আদর্শ-পদ্ধতি—আমাদের আদর্শ এইরূপ হওয়া উচিত যে, আমরা যেন কেবলমাত্র সাধারণ লোকের পর্যবেক্ষণের উপর নির্ভর না করিয়া বৈজ্ঞানিক পরীক্ষণের সাহায্য লই । এই পরীক্ষণের সময় আমাদের কৃত্রিম পরিবেশকে যতদূর সম্ভব প্রাকৃতিক পরিবেশের সমতুল্য করিয়া তুলিতে হইবে । পরীক্ষণের উদ্দীপকগুলি এমনভাবে নির্বাচন করিতে হইবে যেন সেগুলি জীবের স্বাভাবিক বৃত্তিগুলি জাগরিত করিতে পারে । ইহাও দেখিতে হইবে যে, ঐ উদ্দীপকগুলি পরীক্ষিতব্য জীবগুলিকে অকারণ যেন ভীত করিয়া না ফেলে । আবার পরীক্ষাকালে নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গী গ্রহণ করিতে হইবে ; অকারণ আমরা যেন উহাদের উপর মহুস্ফোচিত গুণ আরোপ না করি বা উহাদের ‘কৃতিত্বে’ গোরব বোধ না করি ; অপরপক্ষে আমরা যেন সম্পূর্ণ উদাসীন হইয়া না পড়ি । তাহা ছাড়া, পরীক্ষণের জন্ত এক বিশেষ শ্রেণীর জীবকে আদর্শ হিসাবে গ্রহণ করা উচিত ; ঐ শ্রেণীর পরীক্ষিতব্য জীবগুলিকে ধৈর্যসহকারে (এবং সম্ভব হইলে, আজন্ম) পর্যবেক্ষণ করিতে হইবে । এই সময় তাহাদের ব্যক্তিগত পার্থক্যগুলি (individual differences)-এর উপরও তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখিতে হইবে^৪ ।

৪ Washburn, *Animal Mind*, Ch. I, § 3 & 4 দ্রষ্টব্য ।

মনোবিজ্ঞা

(গ) সংক্ষিপ্ত ইতিহাস :

প্রাণি-মনোবিজ্ঞার অভ্যুদয়ের মূলে আছে ডার্বুইনের বিবর্তনবাদ (doctrine of evolution)। ডার্বুইনের প্রভাবে ইংলণ্ডে ইংরাজ লেখকেরা এবং জার্মানীতে শ্নাইডার (Schneider) গত শতাব্দীর শেষভাগে বিজ্ঞান হিসাবে প্রাণি-মনোবিজ্ঞার গোড়া পত্তন করেন। ১৮৮০ এবং ১৮৮২ সালে শ্নাইডারের রচনা প্রকাশিত হয়। ষ্ট্যানলি হল্ (Stanley Hall) ইত্যাদি শ্নাইডার দ্বারা প্রভাবিত হ'ন।

ডার্বুইনের পরে ভাইস্মান্ (Weismann)-এর বিবর্তন সম্বন্ধীয় মতবাদ যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করে। ভাইস্মানের মতে জীবের অভিজ্ঞতালব্ধ বৈশিষ্ট্যগুলি পরবর্তী বংশধর উত্তরাধিকারসূত্রে পায় না; কেবলমাত্র ডিম্বকোষের মধ্যে পরিবর্তন (germinal variations) সাধিত হইলে তাহা পরবর্তী বংশধরের দেহে পরিবর্তন আনে। যাহা হউক, এই মতবাদের সত্যাসত্য নির্ধারণ করিবার জন্য প্রাণি-মনোবিদগণ পরীক্ষণ আরম্ভ করেন। ম্যাকডুগাল এইজন্ম মূষিকের উপর পরীক্ষা চালান এবং তিনি ভাইস্মানের মত ত্যাগ করেন। (পৃঃ ২৫৬)।

ফাব্রে (Fabre) কীট-পতঙ্গাদি পর্যবেক্ষণ শুরু করেন। তাঁহার পর্যবেক্ষণের বিভিন্ন সংবাদ ১৮৭৯ হইতে ১৯০৪ সাল পর্যন্ত প্রকাশিত হইয়াছিল। ইহার পর দেখা দেয় লাবক্ (Lubbock)-এর গ্রন্থ *Ants, Bees and Wasps*; গ্রন্থের নাম হইতেই বুঝা যাইতেছে যে, তাঁহার পর্যবেক্ষণের বস্তু ছিল পিপীলিকা, মধুমক্ষিকা এবং বোলতা।

উচ্চস্তরের জীব লইয়া আলোচনা শুরু করেন রোমানেস্ (Romanes)। তিনি বিভিন্ন পর্যবেক্ষকের কাহিনী সঙ্কলন করিয়া উচ্চস্তরের জীব সম্বন্ধে সুসংবদ্ধ বর্ণনা প্রস্তুত করেন। তাঁহার প্রণালীকে বলা হইত 'উপকথা-প্রণালী' (anecdotal method)। এই প্রণালীর অসুবিধা হইল যে, তিনি যাহাদের প্রদত্ত বর্ণনা গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাঁহারা কেহই জীবের বাহ্য-ব্যবহারগুলি বিজ্ঞান-সম্মত উপায়ে পর্যবেক্ষণ করেন নাই। (পৃঃ ৫০ দ্রষ্টব্য)।

সুতরাং ইহার বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়া দেখা দেয় লয়েড্ মরগ্যান (Lloyd Morgan)-এর রচনায়। তিনিই সর্বপ্রথম প্রাণি-মনের আলোচনার

ক্ষেত্রে ব্যাপকভাবে পরীক্ষণ-প্রণালী (experimental method) প্রয়োগ করেন। প্রাণি-মনের আলোচনার ব্যাপারে তিনি এই সাবধান বাণী উচ্চারণ করিলেন : “যেখানে জীবের কোন ব্যবহারকে নিম্নতর সরল মানসিক বৃত্তির প্রকাশ হিসাবে ব্যাখ্যা করা যায়, সেখানে উহাকে উচ্চতর জটিল মানসিক বৃত্তির প্রকাশ হিসাবে ব্যাখ্যা করা সমীচীন হইবে না”। ৫

লয়েড্ মরগ্যানের ভাবধারাকে অনুসরণ করিয়া চলেন হব্‌হাউস্ (L. T. Hobhouse)। ১৯০১ সালে ইহার *Mind in Evolution* প্রকাশিত হয়।

ক্ষুদ্র প্রাণী, যথা, কীটপতঙ্গাদি লইয়া আবার আলোচনা শুরু করেন লোয়েব (Jacques Loeb)। তিনি আভিমুখ্যবাদ (tropism) প্রচার করেন। এই মত অনুসারে উদ্দীপকের মধ্যে একটা শক্তি নিহিত থাকে যাহার ফলে কীটপতঙ্গাদি ঐ উদ্দীপকের প্রতি যান্ত্রিকভাবে আকৃষ্ট হয় অথবা উহাকে পরিহার করিয়া চলে। ১৮৯৬ সালে এই মত প্রচারিত হয়। তাঁহার মতকে বিয়ার (Beer), বেট্‌হে (Bethe) ইত্যাদি সমর্থন করেন।

আমেরিকায় এইচ্. এস্. জেনিংস্ (H. S. Jennings) যান্ত্রিকতাবাদ পরিহার করেন এবং তিনি ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র জীবের ব্যবহার পর্যবেক্ষণ করিয়া এই সিদ্ধান্ত করেন যে, যেহেতু ইহাদেরও পারিপার্শ্বিক ব্যবস্থার তারতম্যে বাহ্য ব্যবহারের পরিবর্তন (variability) এবং প্রতিযোজন (adaptability) সাধিত হয়, ইহাদেরও ভিতরে মনের স্বল্প অস্তিত্ব আছে। তাঁহার মতবাদের ব্যাখ্যা পাওয়া যায় তাঁহার *Behavior of Lower Organisms* নামক গ্রন্থে।

১৮৯৮ সালে ই. এল্. থর্নডাইক (E. L. Thorndike) বিড়াল ইত্যাদির উপর গবেষণাগারে পরীক্ষণ চালান। তাঁহার সিদ্ধান্ত হইল

৫ মরগ্যানের ভাষায় : “In no case may we interpret an action as the outcome of the exercise of a higher psychical faculty, if it can be interpreted as the outcome of the exercise of one which stands lower in the psychological scale.” (*Introduction to Comparative Psychology*, p. 5 3). ইহাই Lloyd Morgan's Canon নামে সুবিদিত।

এই সব জীবজন্তুদের শিক্ষণপদ্ধতি (learning) যান্ত্রিকভাবে সাধিত হয়। ইনি কৃত্রিম অবস্থার মধ্যে অর্থাৎ ধাঁধার (puzzle box) মধ্যে বিড়াল ইত্যাদি রাখিয়া পরীক্ষণ চালান।

এই সময়ে আর. এম. ইয়ারকেস্ (R. M. Yerkes) ক্ষুদ্র হইতে উচ্চ পর্যায়ের বহু জীব লইয়া পরীক্ষণ করেন। ইয়ারকেসের দুইটি উল্লেখযোগ্য পরীক্ষণ-পদ্ধতি হইল—‘বহুনির্বাচন-পদ্ধতি’ (multiple choice method) এবং ‘বিলম্বিত প্রতিক্রিয়া পদ্ধতি’ (delayed reaction method)। প্রথমোক্ত পদ্ধতি দ্বারা দেখা যায় যে, যখন কোন প্রাণী একাধিক উদ্দীপকের মধ্য হইতে একটি উদ্দীপককে বাছিয়া লয়, তখন ঐ উদ্দীপককে সে পৃথকভাবে না দেখিয়া অগ্নাত উদ্দীপকের সহিত সম্বন্ধযুক্তভাবে উহাকে দেখে। দ্বিতীয় পদ্ধতিটির ক্ষেত্রে প্রথমে একটি প্রাণীকে উদ্দীপক দেখান হইত এবং তৎক্ষণাৎ উহাকে প্রতিক্রিয়া প্রকাশ করিতে দেওয়া হইত না। কিছুক্ষণ যাইবার পর উহাকে ছাড়িয়া দিয়া দেখা হইত যে, উহা উপযুক্ত প্রতিক্রিয়া দেখাইতে পারে কি না। যদি পারে, তাহা হইলে বুঝা যাইবে যে, উদ্দীপকের প্রত্যক্ষ অবস্থিতির উপর প্রতিক্রিয়া সকল সময় নির্ভর করে না।

রাশিয়ার বেঞ্চেভ্ ও পাবলভ্ প্রত্যাবর্তক ক্রিয়া লইয়া কুকুরের উপর পরীক্ষণ চালান। তাঁহারা দেখান যে, মূল উদ্দীপকের সহিত আর একটি উদ্দীপক যদি কয়েকবার প্রদত্ত হয়, তাহা হইলে মূল প্রতিক্রিয়াটি বিকল্প উদ্দীপকের সহিত সংশ্লিষ্ট হয়। ইহারই নাম সাপেক্ষ প্রত্যাবর্তক ক্রিয়া (conditioned reflex action)। (পৃ: ৩৪৯)।

চেষ্টিতবাদী ওয়াটসন্ থর্গডাইক্ এবং বেঞ্চেভ্ ও পাবলভের পরীক্ষণ দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবিত হ'ন।^৬ ওয়াটসনের নিজস্ব একটি পরীক্ষণের এখানে উল্লেখ করা যাইতে পারে। তিনি কতকগুলি শাদা ইঁদুরকে গোলকধাঁধার মধ্য দিয়া দৌড়াইতে শিখান। পরে তিনি অস্ত্রোপচার দ্বারা এক একটি করিয়া বাহ্যেন্দ্রিয় বাদ দেন। দেখা গেল যে, ইহা সত্ত্বেও ইঁদুরগুলি গোলকধাঁধার পথে দৌড়াইতেছে

এবং তিনি অনুমান করেন যে, চেষ্টাবেদনের (kinæsthetic sensation) দ্বারা ইহা সম্ভব।^৭

গেটান্টবাদীরা বানর ইত্যাদির উপর পরীক্ষণ চালান। এই দলের সমর্থকেরা থর্নডাইকের যান্ত্রিকতাবাদ পরিহার করেন। কোয়েলার বানরের উপর পরীক্ষণ চালান এবং তিনি ও তাঁহার সমর্থকেরা বলেন যে, প্রাণী যখন প্রতিক্রিয়া করে, তখন ‘সমগ্র ক্ষেত্র’ (total field)-এর উপরই প্রতিক্রিয়া করে। ইহাদের শিক্ষণ যান্ত্রিকতার পথে চলে না—উহার মূলে আছে পরিজ্ঞান (insight)^৮।

২। শিশু-মনোবিদ্যা (Child Psychology) :

শিশু-মনোবিজ্ঞান শিশুর মন লইয়া আলোচনা করে, অর্থাৎ জন্ম হইতে কৈশোর পর্যন্ত মানবশিশুর ক্রমবর্ধমান মনই হইল ইহার আলোচ্য বিষয়।

(ক) মনোবিদের দৃষ্টিতে শিশু :

শিশু-মনকে এক বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গী হইতে মনোবিৎ আলোচনা করেন।

(ক) শিশু এক বিশেষ শক্তিপুঞ্জ (energy system)-স্বরূপ। শিশু ও তাহার পরিবেশ প্রতিনিয়তই পরস্পরের উপর ঘাত-প্রতিঘাত করিতেছে। বাহ্য জগৎ হইতে উদ্দীপক আসিয়া তাহার ইন্দ্রিয়গুলিকে সক্রিয় রাখে এবং সে পেশীসমূহকে সঞ্চালিত করিয়া নানাভাবে প্রতিক্রিয়া করে। তাহা হইলে দেখা যাইতেছে যে, বাহ্য জগৎ হইতে খাড়া ইত্যাদির মাধ্যমে যে শক্তি সে সঞ্চয় করে, বাহ্য জগতের উপর প্রতিক্রিয়ার ফলে তাহা ব্যয়িত হয়।

(খ) শিশু ক্রমবর্ধমান জীব। প্রতিনিয়তই তাহার দেহের ও মনের পরিবর্তন হইতেছে। তাহার দৈহিক গঠন সাধিত হইতেছে, সামাজিকতা-বোধ দেখা দিতেছে, পারিপার্শ্বিক ব্যক্তি ও বস্তুনিচয়ের প্রতি আগ্রহ জন্মিতেছে, বাহ্য পরিবেশের সহিত প্রতিযোজনের চেষ্টা চলিতেছে, ধী-শক্তি বাড়িতেছে, বহুবিধ আবেগ সে প্রকাশ করিতেছে, বিভিন্ন অনুভূতিবোধের

৭ পরে ল্যস্লে (Lashley) এই পক্ষে পরীক্ষণ চালান এবং শেষ পর্যন্ত মেরুদণ্ডের পরিবহন পথ (conduction path) নষ্ট করিয়া দেন, অর্থাৎ চেষ্টাবেদনের সম্ভাবনাও তিরোহিত হইল। আশ্চর্যের বিষয় ইঁদুরগুলি তাহা সত্ত্বেও দোড়াইতে লাগিল!

৮ ৪র্থ অধ্যায়, ২য় অনুচ্ছেদ এবং ১৫শ অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

ক্ষমতা জাগিতেছে। এক কথায় বলিতে গেলে, প্রতিক্ষেত্রেই শিশু নব নব শক্তি ও দক্ষতার উন্মেষের প্রমাণ দিতেছে। সে শৈশবের অক্ষম অবস্থা হইতে ধীরে ধীরে আত্মনির্ভরশীল ব্যক্তিত্বের পথে চলিয়াছে। তাহার এই ক্রমবিকাশ অন্তর্নিহিত শক্তিদ্বারা নির্দিষ্টপথে চালিত হয়। (গ) প্রতি শিশু একটি বিশেষ কৃষ্টির মধ্যে বর্ধিত হয়। এই কৃষ্টি জাতিগত, সমাজগত ও পরিবারগত। যে জাতি, যে সমাজ, যে পরিবারের মধ্যে সে জন্মগ্রহণ করে, তাহা হইতে তাহার ভাবধারা ও আদর্শ গঠনের উপাদান সে সংগ্রহ করে। এইজন্য বিভিন্ন শিশুর মনে বিভিন্ন আদর্শবোধ বা মূল্যবোধ (value consciousness) জাগে। (ঘ) বাহ্য জগতের সহিত আদান-প্রদানের সময় শিশুকে বিভিন্ন বিষয় নির্বাচন ও পরিত্যাগ করিতে হয়। সে দেখে যে, সে যখন একটি কাজ করিতেছে তখন অপর কাজ করা যায় না; যেমন, দুধ খাইবার সময় সে বল খেলিতে পারে না। আবার এমন অনেক কার্য আছে যাহা সে করিতে চায়, কিন্তু পরিণতবয়স্কেরা তাহাতে বাধা দেয়; অতএব বাধ্য হইয়া ক্রমশঃ সেগুলি পরিত্যাগ করিতে হয়। তাহা ছাড়া, কতকগুলি দ্রব্য আছে যেগুলি কষ্টদায়ক; যেমন, আগুনে হাত দিলে হাত পুড়িয়া যায়। অতএব ঐ সব দ্রব্য পরিত্যাজ্য। (ঙ) শিশু তাহার দৈহিক গঠনের সহিত ক্রমশঃ বাহ্য অবস্থাগুলি আয়ত্তে আনিবার চেষ্টা করে। এক একটি কার্যে সাফল্য লাভ করিবার সঙ্গে সঙ্গে তাহার উৎসাহ বাড়িয়া যায়। ক্রমশঃ সে আবিষ্কার করে যে, কাহারও সাহায্য না লইয়াই সে চলিতে পারিতেছে, নিজেই জামা পরিতেছে, উচু জায়গা হইতে জিনিষ নামাইতেছে। এইভাবে ধীরে ধীরে সে আত্মনির্ভরশীল ও আত্ম-মর্যাদাসম্পন্ন হইয়া পড়ে। (চ) বাহ্য-সমাজের সহিত সম্পর্ক স্থাপন করিতে সে সক্ষম হয়। সে দেখে অল্প লোকে তাহার কার্যাবলী লক্ষ্য করিতেছে এবং তাহার নিন্দা বা স্তুত্যাতি করিতেছে। স্তুতরাং বাহ্য-সমাজের আদর্শের সহিত নিজেকে মিলাইয়া লইবার এবং ঐভাবে অপরের প্রশংসা লাভের সে চেষ্টা করে। (ছ) যে শিশু বাহ্য-সমাজের সহিত সমতা বিধান করিয়া চলিতে না পারে, সে ক্রমশঃ অস্বাভাবিক শিশুর (abnormal children) গোষ্ঠীভুক্ত হয়। ভাবী-জীবনে এইসব শিশুদের কেহ উদ্বায়ুগ্রস্ত, কেহ বা অপরাধপ্রবণ, কেহ বা নির্বোধ ব্যক্তিতে পরিণত হয়।

(খ) বিষয়-বস্তু :

শিশু-মনোবিজ্ঞান আলোচ্য বিষয়-বস্তুগুলি সাধারণভাবে এইরূপ বর্ণনা করা যাইতে পারে :

- (১) শিশুর মনের ক্রমবিবর্তন এবং মনের বিভিন্ন পর্যায়ের বৈশিষ্ট্য নির্ধারণ ;
- (২) শিশুর ব্যক্তিত্বের উপর বংশপ্রভাব ;
- (৩) শিশুর ব্যক্তিত্বের উপর সামাজিক ও পারিবারিক পরিবেশের প্রভাব ;
- (৪) শিশু-জীবনে বুদ্ধির বিকাশ ;
- (৫) শিশু-জীবনে বিভিন্ন আবেগের উদ্ভব ;
- (৬) শিশুর সহজ-প্রবৃত্তি ও প্রেরণা ;
- (৭) শিশুর বিভিন্ন ক্রিয়া ও চেষ্টাধিষ্ঠান ;
- (৮) শিশুর শিক্ষণ-পদ্ধতি ;
- (৯) শিশুর মানসিক স্বাস্থ্য ;
- (১০) শিশু, কিশোর ও পরিণতবয়স্কদের মনের তুলনা ও পার্থক্য ।

আবার শিশু-মন সম্বন্ধে এইরূপ আলোচনালব্ধ সাধারণ জ্ঞান কতকগুলি বিশেষ ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা হয় ; ফলে নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলি আলোচিত হয়—

- (১) শিশুর মানসিক স্বস্থতা রক্ষা করিবার জন্য কিরূপ সৃষ্টি পরিবেশ রচনা করা প্রয়োজন ?
- (২) শিশুর বুদ্ধি বা ধী-শক্তি, স্মৃতিশক্তি ইত্যাদির প্রাথমিক-বৃদ্ধি কিরূপে সম্ভব ?
- (৩) শিশুর ব্যক্তিত্বের কোন ক্ষতি না করিয়া তাহার আবেগ, ইচ্ছা ইত্যাদিকে কিভাবে নিয়ন্ত্রিত করা যায় ?
- (৪) শিশুর শিক্ষণ কোন্ পথে চালিত করা উচিত ?
- (৫) শিশুর মানসিক স্বাস্থ্য কিরূপে রক্ষা করা যায় ? অস্বাভাবিক শিশু, অর্থাৎ বিপথগামী শিশু, অল্পবুদ্ধি বা নিবুদ্ধি শিশু, অপরাধপ্রবণ শিশু ইত্যাদি শিশুকে কিভাবে এবং কতদূর স্বাভাবিক পথে আনা যায় ? তথাকথিত ‘দুষ্ট ছেলের’ (problem children) সমস্যা কিরূপে সমাধান করা যায় ?

(গ) সংক্ষিপ্ত ইতিহাস :

ডারউইনের বিবর্তনবাদের প্রভাবে বিভিন্ন ব্যবহারিক ক্ষেত্রে মনোবিজ্ঞান যে সব প্রয়োগ হইয়াছে তাহার ফলে মনোবিজ্ঞান কয়েকটি শাখায় সৃষ্টি হইয়াছে ; এবং শিশু-মনোবিজ্ঞান তাহাদের অন্যতম । ডারউইন তাঁহার *Biographical Sketch of an Infant* নামক পুস্তকে শিশু-জীবন সম্বন্ধে পর্যালোচনা করেন । তবে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী হইতে সৃষ্টিভাবে শিশু-মন লইয়া আলোচনা আরম্ভ করেন প্রেয়ার (W. T. Preyer) ; তাঁহার রচিত *Mind of the Child* বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করে—তবে তিনি তাঁহার পুস্তকে বাস্তব পর্যবেক্ষণ ও তাঁহার স্বকীয় ব্যাখ্যা বা মত এই দুইটি পৃথকভাবে নির্দেশ করেন নাই ।

ভুণ্টের পরীক্ষাগার হইতে আমেরিকায় প্রত্যাবর্তন করিয়া ষ্টানলি হল্ (G. Stanley Hall) শিশুমন লইয়া গবেষণা চালাইতে থাকেন । ১৮৯১ সালে তিনি *Pedagogical Seminary* নামে এক পত্রিকা প্রকাশ করেন—শিশুর মনোভাব, প্রতিভাস এবং ব্যক্তিত্ব (ideas, attitude and personalities) লইয়া আলোচনা করাই ইহার মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল । ১৮৯৩ সালে সালি (Sully) শিশু-মন আলোচনার জন্ত ইংলণ্ডে *British Association for Child Study* নামে এক প্রতিষ্ঠান স্থাপন করেন । তিনি *Studies of Childhood* নামে এক পুস্তক রচনা করেন—ইহা ১৮৯৫ সালে প্রকাশিত হয় । কার্ল গুজ (Karl Groos) *Play of Animals* এবং *Play of Man* প্রকাশ করেন । ১৯০০ সালে শিন্ (Shinn)-এর *The Biography of a Baby* এবং ১৯০৪ সালে হল্-এর *Adolescence* প্রকাশিত হয় ।

এ দিকে ফ্রান্সে বিনে (Binet) ১৯০৪ সালে শিশুদের বুদ্ধি-পরিমাপের জন্ত পরীক্ষণের উপায় উদ্ভাবন করেন এবং ময়মান্ (Meumann) জার্মানীতে ঐ পরীক্ষণ চালাইতে থাকেন । ইহার ফলে শিশু-মনের আলোচনা বিশেষ অগ্রসর লাভ করে ।

১৯১৬ সালে জে. বি. ওয়াটসন্ শিশুর ব্যবহার লইয়া আমেরিকার বাণ্টমোরস্ ফিপ্‌স্ ক্লিনিক (Phipps Clinic)-এ গবেষণা চালান ।

ইহার গবেষণায় স্বতঃই ব্যবহারের উপর—বিশেষতঃ শিশুর প্রচয় (development), শিক্ষণ ইত্যাদি লইয়া পরিমাণগত আলোচনার উপর—বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়।

ভিয়েনায় কার্ল বুয়েলার (Karl Bühler) এবং শার্লোট্ বুয়েলার (Charlotte Bühler) পরীক্ষণের উপর ভিত্তি করিয়া শিশু-মন লইয়া আলোচনা করেন।

জেনেভা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক জঁ। পিয়াজে (Jean Piaget)-এর গবেষণাকার্য সুদূরপ্রসারী। ২ হইতে ১৪ বৎসর পর্যন্ত বালক-বালিকা পরীক্ষা করিয়া তিনি বাহ্য পরিবেশ সম্বন্ধে শিশুর ধারণা কিরূপে গড়িয়া উঠে তাহা লইয়া নির্দিষ্ট পরীক্ষণ-পদ্ধতি উদ্ভাবনের প্রচেষ্টা করেন।

পিয়াজে বলেন যে, শিশু প্রথমে থাকে আত্মকেন্দ্রিক (egocentric) এবং তাহার দৃষ্টিভঙ্গী থাকে বাস্তব (realistic), অর্থাৎ তাহার নিজের কাছে কোন কিছু যেমন প্রতিভাত হয়, অন্তের নিকটও সেইরূপ হইবে, ইহাই তাহার ধারণা। আবার সে মনে করে যে, সে যেরূপ দেখিতেছে, বাহিরের জগতের বস্তু বাস্তবিকই সেইরূপ। ইহার পর আসে জাগতিক বস্তুসমূহে ‘মানসিক অংশগ্রহণ’ (mental participation); সে তখন তাহার নিজের মত করিয়া বাহিরের সব কিছু দেখে, অর্থাৎ তাহার যেমন মন আছে বাহ্য বস্তুসমূহ সেইরূপ আছে, ইহাই সে মনে করে। নিজের উপমা দ্বারা সে বাহ্য জগৎকে বৃষ্টিতে চেষ্টা করে। তাঁহার রচিত *The Language and Thought of the Child* এবং *The Child's Conception of the World* গ্রন্থে তিনি ইহা আলোচনা করেন।

পিয়াজের আর একটি অবদান হইল যে, তিনি সমাজতত্ত্বের দৃষ্টিভঙ্গী (sociological standpoint) হইতে শিশু-মনের আলোচনার পথ প্রদর্শন করেন। তাঁহার *The Moral Judgment of the Child* গ্রন্থে তিনি সামাজিক অনুশাসনে শিশুর গ্নায়-অগ্নায় বোধ বা নৈতিক-জ্ঞান কিরূপে গড়িয়া উঠে তাহাই আলোচনা করেন।

এ দিকে ফ্রয়েডের নেতৃত্বে মনঃসমীক্ষণ (psychoanalysis)-এর প্রসারের সঙ্গে শিশুর মানসিক অসুস্থতার কারণ সম্বন্ধে বহুবিধ আলোচনা ও অনুসন্ধান শুরু হয়। ফ্রয়েডের পর তাঁহার কন্যা আনা ফ্রয়েড (Anna Freud) এবং এস. আইজাক্স (S. Isaacs) এ বিষয়ে অনুসন্ধান চালাইয়া যান।

গেস্টাল্ট দৃষ্টিভঙ্গী হইতে কফ্কা (Koffka) শিশুর মানসিক প্রচয় ও উন্নতি (development and progress) সম্বন্ধে আলোচনা করেন। তাঁহার *The Growth of Mind* পুস্তকটি এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য।^৯

৩। সমাজ-মনোবিজ্ঞান (Social Psychology) :

(ক) বিষয়-বস্তু :

যদিও আমরা এক একজন ব্যক্তিকে পৃথকভাবে দেখি, তাহা হইলেও কোন ব্যক্তিকেই একেবারে অগ্ন হইতে বিচ্ছিন্ন বা সমাজচ্যুত অবস্থায় দেখা যায় না। মানুষ সামাজিক জীব—সুতরাং সমাজের অগ্ন ব্যক্তির সহিত ভাবের আদান-প্রদানের মাধ্যমে তাহার মন গড়িয়া উঠে। সমাজের প্রভাব প্রতি মানবেরই চিন্তা, অনুভূতি ও ক্রিয়ার মাধ্যমে প্রকাশ পায়। এইজন্য ব্যক্তি-মন আলোচনা করিতে যাইয়া মনোবিজ্ঞান ক্রমশঃ সমাজ-মনের আলোচনায় উপনীত হয়। অবশ্য সমাজ-মন বলিতে ব্যক্তি-মন হইতে পৃথক কোন সত্তা বুঝায় না। সমাজের বিভিন্ন ব্যক্তির মিথস্ক্রিয়ার মাধ্যমেই এই সমাজ-মন গঠিত হয়।

সমাজ-মনোবিজ্ঞানের বিষয়-বস্তু হইল সমাজভুক্ত ব্যক্তির মিথস্ক্রিয়া বা পারস্পরিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া এবং ব্যক্তি-বিশেষের চিন্তা, অনুভূতি

^৯ শিশু-মন সম্বন্ধে বহু পুস্তক রচিত হইয়াছে। তবে নিম্নলিখিত গ্রন্থদ্বয়ে বিভিন্ন লেখকের মনোজ্ঞ রচনা পাওয়া যাইবে :

- (১) *Manual of Child Psychology* (Ed. by Leonard Carmichael) :
- (২) *Handbook of Child Psychology* (Ed. by C. A. Murchison).

ও কার্যের উপর ঐরূপ মিথাক্রিয়ার প্রভাব।^{১০} পরিবার ও সমাজের বৃহত্তর পরিপ্রেক্ষিতে ব্যক্তিবর্গের কৃষ্টি কিভাবে গড়িয়া উঠে, কিরূপে পরস্পরকে প্রভাবিত করে, কিরূপে জনমত গড়িয়া উঠে, কিরূপে সামাজিক আদর্শ ও কল্লনা রচিত হয়, জন-নেতৃত্ব কিরূপে সম্ভব হয়, জনতার ত্রায় ক্ষুদ্র জন-সমন্বয় হইতে আরম্ভ করিয়া জাতীয় মন পর্যন্ত বিভিন্ন জন-সমন্বয়ের মানসিক বৈশিষ্ট্য কি কি, উত্তেজনা, বিদ্রোহ, গণ-আন্দোলন, যুদ্ধ ইত্যাদির সময় জন-মনের অবস্থা কিরূপ হয়, আন্তর্জাতিক উত্তেজনা বা তান (tension)-এর কারণ বিশ্লেষণ ইত্যাদি বিষয় সমাজ-মনোবিচার আলোচনার অন্তর্ভুক্ত।

মোটামুটিভাবে বলা যায় যে, সমাজ-মনোবিচার বিষয়-বস্তু হইল : (১) ব্যক্তি-বিশেষের ব্যক্তিত্বের সহিত সমাজ ও সামাজিক কৃষ্টির সম্বন্ধ, (২) বিভিন্ন প্রকারের আন্তর্ব্যক্তিক ও আন্তর্গোষ্ঠীয় দ্বন্দ্ব (inter-individual and inter-group conflict), (৩) জন-ব্যবহার (mass-behaviour)।

এই সব বিষয়ের আলোচনা-লব্ধ জ্ঞান ব্যবহারিক ক্ষেত্রে প্রয়োগ করিয়া কতকগুলি প্রশ্নের উত্তর বা সমস্যা সমাধানের প্রচেষ্টা করা হয় ; যেমন,

- (১) কিরূপে জনমত পরিমাপ করা যায় ?
- (২) কিরূপে প্রচার কার্য চালান হয় ?
- (৩) কিরূপে জনমত প্রভাবিত করা যায় ?
- (৪) কিরূপে জনগণের নৈতিক মনোবল (morale) রক্ষা করা যায় ?
- (৫) একদেশদর্শিতা, পক্ষপাতিত্ব (prejudice) ও কুসংস্কার (superstition) কতদূর প্রভাবশালী হয় এবং কিরূপে উহাদের দূর করা যায় ?
- (৬) বিভিন্নক্ষেত্রে—যথা ক্ষুদ্র দলের মধ্যে, পারিবারিক পরিবেশে, শিল্পায়তনে, আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে—তান বা উত্তেজনা (tension) কিভাবে প্রশমিত করা যায় ?

১০ ভুলনীয় : (১) Kimball Young, *A Handbook of Social Psychology*, p. 1 : "Social Psychology is the study of persons in their interactions with one another and with reference to the effects of this interplay upon the individual's thoughts, feelings, emotions and habits."

(২) *Present-day Psychology*, Ed. by Roback, p. 376 : "...Social Psychology has become increasingly concerned with the development of the individual in the broader context of the family and community with their complexity of cultural influences."

এ দিকে ফ্রয়েডের নেতৃত্বে মনঃসমীক্ষণ (psychoanalysis)-এর প্রসারের সঙ্গে শিশুর মানসিক অসুস্থতার কারণ সম্বন্ধে বহুবিধ আলোচনা ও অনুসন্ধান শুরু হয়। ফ্রয়েডের পর তাঁহার কন্যা আন্না ফ্রয়েড (Anna Freud) এবং এস. আইজাক্স (S. Isaacs) এ বিষয়ে অনুসন্ধান চালাইয়া যান।

গেস্টাল্ট দৃষ্টিভঙ্গী হইতে কফ্কা (Koffka) শিশুর মানসিক প্রচয় ও উন্নতি (development and progress) সম্বন্ধে আলোচনা করেন। তাঁহার *The Growth of Mind* পুস্তকটি এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য।^৯

৩। সমাজ-মনোবিজ্ঞান (Social Psychology) :

(ক) বিষয়-বস্তু :

যদিও আমরা এক একজন ব্যক্তিকে পৃথকভাবে দেখি, তাহা হইলেও কোন ব্যক্তিকেই একেবারে অগ্ন হইতে বিচ্ছিন্ন বা সমাজচ্যুত অবস্থায় দেখা যায় না। মানুষ সামাজিক জীব—সুতরাং সমাজের অগ্ন ব্যক্তির সহিত ভাবের আদান-প্রদানের মাধ্যমে তাহার মন গড়িয়া উঠে। সমাজের প্রভাব প্রতি মানবেরই চিন্তা, অনুভূতি ও ক্রিয়ার মাধ্যমে প্রকাশ পায়। এইজন্য ব্যক্তি-মন আলোচনা করিতে যাইয়া মনোবিজ্ঞান ক্রমশঃ সমাজ-মনের আলোচনায় উপনীত হয়। অবশ্য সমাজ-মন বলিতে ব্যক্তি-মন হইতে পৃথক কোন সত্তা বুঝায় না। সমাজের বিভিন্ন ব্যক্তির মিথস্ক্রিয়ার মাধ্যমেই এই সমাজ-মন গঠিত হয়।

সমাজ-মনোবিজ্ঞানের বিষয়-বস্তু হইল সমাজভুক্ত ব্যক্তির মিথস্ক্রিয়া বা পারস্পরিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া এবং ব্যক্তি-বিশেষের চিন্তা, অনুভূতি

^৯ শিশু-মন সম্বন্ধে বহু পুস্তক রচিত হইয়াছে। তবে নিম্নলিখিত গ্রন্থদ্বয়ে বিভিন্ন লেখকের মনোজ্ঞ রচনা পাওয়া যাইবে :

- (১) *Manual of Child Psychology* (Ed. by Leonard Carmichael) ;
- (২) *Handbook of Child Psychology* (Ed. by C. A. Murchison).

ও কার্যের উপর ঐরূপ মিথাক্রমার প্রভাব।^{১০} পরিবার ও সমাজের বৃহত্তর পরিপ্রেক্ষিতে ব্যক্তিবর্গের কৃষ্টি কিভাবে গড়িয়া উঠে, কিরূপে পরস্পরকে প্রভাবিত করে, কিরূপে জনমত গড়িয়া উঠে, কিরূপে সামাজিক আদর্শ ও কল্লনা রচিত হয়, জন-নেতৃত্ব কিরূপে সম্ভব হয়, জনতার গ্রায় ক্ষুদ্র জন-সমন্বয় হইতে আরম্ভ করিয়া জাতীয় মন পর্যন্ত বিভিন্ন জন-সমন্বয়ের মানসিক বৈশিষ্ট্য কি কি, উত্তেজনা, বিদ্রোহ, গণ-আন্দোলন, যুদ্ধ ইত্যাদির সময় জন-মনের অবস্থা কিরূপ হয়, আন্তর্জাতিক উত্তেজনা বা তান (tension)-এর কারণ বিশ্লেষণ ইত্যাদি বিষয় সমাজ-মনোবিজ্ঞান আলোচনার অন্তর্ভুক্ত।

মোটামুটিভাবে বলা যায় যে, সমাজ-মনোবিজ্ঞান বিষয়-বস্তু হইল : (১) ব্যক্তি-বিশেষের ব্যক্তিত্বের সহিত সমাজ ও সামাজিক কৃষ্টির সম্বন্ধ, (২) বিভিন্ন প্রকারের আন্তর্ব্যক্তিক ও আন্তর্গোষ্ঠীয় দ্বন্দ্ব (inter-individual and inter-group conflict), (৩) জন-ব্যবহার (mass-behaviour)।

এই সব বিষয়ের আলোচনা-লব্ধ জ্ঞান ব্যবহারিক ক্ষেত্রে প্রয়োগ করিয়া কতকগুলি প্রশ্নের উত্তর বা সমস্যা সমাধানের প্রচেষ্টা করা হয় ; যেমন,

- (১) কিরূপে জনমত পরিমাপ করা যায় ?
- (২) কিরূপে প্রচার কার্য চালান হয় ?
- (৩) কিরূপে জনমত প্রভাবিত করা যায় ?
- (৪) কিরূপে জনগণের নৈতিক মনোবল (morale) রক্ষা করা যায় ?
- (৫) একদেশদর্শিতা, পক্ষপাতিত্ব (prejudice) ও কুসংস্কার (superstition) কতদূর প্রভাবশালী হয় এবং কিরূপে উহাদের দূর করা যায় ?
- (৬) বিভিন্নক্ষেত্রে—যথা ক্ষুদ্র দলের মধ্যে, পারিবারিক পরিবেশে, শিল্পায়তনে, আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে—তান বা উত্তেজনা (tension) কিভাবে প্রশমিত করা যায় ?

১০ ভুলনীয় : (১) Kimball Young, *A Handbook of Social Psychology*, p. 1 : "Social Psychology is the study of persons in their interactions with one another and with reference to the effects of this interplay upon the individual's thoughts, feelings, emotions and habits."

(২) *Present-day Psychology*, Ed. by Roback, p. 376 : "...Social Psychology has become increasingly concerned with the development of the individual in the broader context of the family and community with their complexity of cultural influences."

উপরের বর্ণনা হইতে বুঝা যাইতেছে যে, সমাজ-মনোবিজ্ঞানকে বহুবিধ বিজ্ঞানের সাহায্য লইতে হয়। সমাজের বিবর্তনের ইতিহাস ও গঠন-ভঙ্গিমা জানিবার জন্ত সমাজবিজ্ঞান (sociology) এবং ইতিহাসের সাহায্য লইতে হয়। বিভিন্ন জাতির বৈশিষ্ট্য জানিবার জন্ত নৃতত্ত্ব (Anthropology)-এর জ্ঞান প্রয়োজন। শৈশব অবস্থা হইতে সামাজিক পরিবেশের মধ্যে কিভাবে ধীরে ধীরে ব্যক্তির মনে “অহং”-জ্ঞান জাগিয়া উঠে, অর্থাৎ “সামাজিক অহং-বোধ” (social self) দেখা দেয়, তাহা জানিবার জন্ত শিশু-মনোবিজ্ঞানের জ্ঞানের প্রয়োজন। সামাজিক জীবনের উন্নতির জন্ত শিক্ষার মান ও আদর্শ নির্ধারণ করা প্রয়োজন; সেইজন্ত শিক্ষা-মনোবিজ্ঞান (Educational Psychology) ও শিক্ষা-বিজ্ঞান (Pedagogics)-এর সাহায্য গ্রহণ করিতে হয়। সামাজিক জীবনে নৈতিক আদর্শ (moral ideal)-এর এবং জীবন-দর্শনের প্রভাব জানিতে হইলে নীতিবিজ্ঞান (ethics) এবং দর্শন (philosophy) সম্বন্ধেও কিছু জ্ঞান প্রয়োজন।

সমাজ-জীবন সর্বদাই গতিশীল। সুতরাং যে সব বিজ্ঞান সামাজিক জীবনের কোন না কোন বিষয়ের আলোচনা করে সেগুলি সর্বদাই প্রগতিশীল। এই কারণে সমাজ-মনোবিজ্ঞানের বিভিন্ন লেখকেরা ভিন্ন ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গী, আলোচ্য বিষয়বস্তু ও আলোচনা-পদ্ধতি গ্রহণ করিয়াছেন।^{১১}

(খ) সংক্ষিপ্ত ইতিহাস :

প্রাণি-মনোবিজ্ঞান ও শিশু-মনোবিজ্ঞানের উদ্ভবের পশ্চাতে যেমন ডারউইনের বিবর্তনবাদের প্রভাব বিद्यমান, সেইরূপ সমাজ-মনোবিজ্ঞানের পশ্চাতেও ডারউইনের প্রভাব আছে। শিশু-মনোবিজ্ঞানের অগ্রতম বিষয়-বস্তু হইল শিশু-মন কিভাবে ধীরে ধীরে কৈশোর ও যৌবনের সীমারেখায় উপস্থিত হয়; সেইরূপ জাতির মন কিরূপে ধীরে ধীরে

১১ ডুললীর : “These developments (of allied sciences) have thrown social-psychological research into a state of flux and influx—flux of what is to be considered the rightful subject-matter of social-psychology study and the influx of a multiplicity of approaches, concepts, methodologies, and theoretical models for interpreting the old and investigating the new...And no one technique is adequate to obtain the necessary data.” (*Present-day Psychology*, p. 378).

বিবর্তনের পথে যায় তাহা আলোচনা করিবার ফলে সমাজ-মনোবিজ্ঞান উদ্ভব হয়^{১২}।

জেমস্ মার্ক বাল্ডুইন্ (James Mark Baldwin)-রচিত *Mental Development in the Child and the Race* (১৮৯৫) প্রকাশের পর হইতে মনোবিজ্ঞান দৃষ্টিভঙ্গী হইতে জাতির বিবর্তনকে আলোচনা করা আরম্ভ হয়।

হার্বার্ট স্পেন্সার^{১৩} তাঁহার *Principles of Sociology* (তিন খণ্ড—১৮৯৯) গ্রন্থে মানব-সমাজের বিবর্তনকে ব্যাখ্যা করিবার প্রচেষ্টা করেন। তাঁহার *Synthetic Philosophy*-তে ব্যাখ্যাত বিবর্তনবাদকে তিনি সমাজের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করেন। প্রকৃতপক্ষে আধুনিক কালে ইহাই সমাজ-মনের উপর রচিত প্রথম প্রামাণিক গ্রন্থ।

ইহার পর নাম করা যাইতে পারে গেব্রিয়েল টার্ডে (Gabriel Tarde)-রচিত *Laws of Imitation*-এর। ইহাতে তিনি দেখাইতে চাহেন যে, মানুষের বিভিন্ন ক্রিয়া একে অন্তের অনুরূপের ফলে সঞ্চারিত হইয়াছে। মানব-মনের ক্রিয়া তিন প্রকারের—বাহ্য-জগতের উপর প্রতিক্রিয়া, অপর মনের উপর প্রতিক্রিয়া এবং স্বকীয় মনের উপর প্রতিক্রিয়া। ইহাদের মধ্যে শেষোক্ত দুইটিরই মানব-মনের উপর সর্বাধিক প্রভাব।

এই যুগের আর একটি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ হইল ল্য বঁ (Le Bon)-রচিত *The Crowd* (১৮৯৫)। ইনি জনতার ব্যবহার (যাহা অযৌক্তিক ও উচ্ছৃঙ্খল) লইয়া আলোচনা করেন। ইনি বলেন যে, জনতার মধ্যে ব্যক্তি-বিশেষের ব্যবহার সমাজ-জীবনে নিয়ন্ত্রণের লোকের অনুরূপ হয়।

বর্তমান শতকের সর্বপ্রথম উল্লেখযোগ্য পুস্তক হইল উইলিয়াম ম্যাকডুগ্যালের *An Introduction to Social Psychology* (১৯০৮)। ইহাতে তিনি সহজ-প্রবৃত্তি (instinct) সম্বন্ধে তাঁহার অভিনব মতবাদ

১২ এক হিসাবে ডারউইনের পূর্বে বিবর্তনের কথা বলিয়াছিলেন কোঁৎ (August Comte)। তিনি বলেন যে, মানব-সমাজ প্রথমে ধর্মের স্তর, তাহার পর দার্শনিক আলোচনার স্তর এবং শেষ পর্যন্ত বাস্তব বৈজ্ঞানিক অভিজ্ঞতার স্তরে আসিয়াছে।

১৩ 'Comparative Psychology' (তুলনামূলক মনোবিজ্ঞান) এই নামটি স্পেন্সার ১৮৭৬ সালে প্রকাশিত তাঁহার রচনার নামলিপি হিসাবে সর্বপ্রথম ব্যবহার করেন।

মনোবিজ্ঞা

প্রচার করেন। এই সহজ-প্রবৃত্তি বিশ্লেষণ করিলে পাওয়া যাইবে ; (১) প্রত্যক্ষলব্ধ জ্ঞান, (২) আবেগ বা প্রকোভ, (৩) কার্য করিবার প্রচেষ্টা। প্রতি আবেগের মূলে থাকে সহজপ্রবৃত্তির তাড়না এবং প্রতি সহজপ্রবৃত্তির অন্তঃস্থলে আছে কোন না কোন আবেগ বা প্রকোভ। ম্যাকডুগাল বলেন যে, সামাজিক জীবনের কার্যাবলী সহজাত প্রবৃত্তি (যাহাকে বলা হয় ‘গতীয় উৎস’ বা *dynamic source*) হইতে উদ্ভূত। (পৃঃ ৪১৮)।

ম্যাকডুগালের প্রভাবে অত্যন্ত লেখকেরাও সহজ প্রবৃত্তির কথা বলিতে লাগিলেন এবং সকলেই কোন না কোন ‘নূতন’ সহজপ্রবৃত্তির উল্লেখ করিতে লাগিলেন। সামাজিক জীবনের সকল ব্যবহারকে এই ‘গতীয় দৃষ্টিভঙ্গী’ হইতে ব্যাখ্যা করা হইতে লাগিল। থর্নডাইক্ তাঁহার *The Original Nature of Man* এবং উড্‌ওয়ার্থ তাঁহার *Dynamic Psychology* গ্রন্থে এই দৃষ্টিভঙ্গী গ্রহণ করেন। উইলফ্রেড ট্রটার (Wilfred Trotter)-এর *Instincts of the Herd in Peace and War* (১৯১৬) গ্রন্থে সমাজ-মনোবিজ্ঞার আলোচনা সম্পূর্ণরূপে সহজপ্রবৃত্তির আলোকে চালান হয়।

১৯১৯ সালে ডান্‌লাপ্ (Dunlap) সর্বপ্রথম সহজ-প্রবৃত্তির মতবাদের বিরোধিতা করেন। ইহার ফলে কয়েক বৎসর অনেক লেখক আবার সহজপ্রবৃত্তির মতবাদকে সমালোচনা করিতে সুরু করেন।

সমাজ-মনোবিজ্ঞার আলোচনা এতদিন বাচনিক দৃষ্টিভঙ্গী (theoretical standpoint) হইতে পরিচালিত হইতেছিল। পরীক্ষণ-পদ্ধতি (experimental method)-এর উপর ভিত্তি করিয়া সমাজ-মনোবিজ্ঞার আলোচনা সুরু করেন ভাল্ট্‌হের মোয়েডে (Walther Möde), হিউগো ম্যুনেস্টের্‌বের্গ (Hugo Münsterberg) এবং এফ্. এইচ্. অল্‌পোর্ট (F. H. Allport)। অল্‌পোর্ট এই বিষয়ে যথেষ্ট প্রতিপত্তি লাভ করেন এবং আমেরিকার লেখকদের উপর বিশেষ প্রভাব বিস্তার করেন। গার্ডনার মারফি (Gardner Murphy), নিউকোম (Newcomb) ইত্যাদি অনেকে “পরীক্ষণমূলক সমাজ-মনোবিজ্ঞা” (Experimental Social Psychology)-র উপর গ্রন্থ রচনা করেন।

অনেক লেখক আবার এক একটি জাতি লইয়া পরীক্ষণমূলকভাবে গবেষণা করেন। যেমন, ম্যালিনোস্কি (Malinowski) পশ্চিম প্রশান্ত মহাসাগরের ট্রোব্রিয়াণ্ড্ দ্বীপের অধিবাসীদের সামাজিক জীবন, এবং মার্গারেট্ মিড্ (Margaret Mead) সামোয়া দ্বীপের বালিকা ও কিশোরীদের জীবনী পর্যালোচনা করেন।

আমেরিকার কয়েকজন মনোবিৎ আর একটি পরীক্ষণমূলক প্রচেষ্টা আরম্ভ করিয়াছেন—ইহার নাম দেওয়া হইয়াছে ‘সামাজিক প্রলক্ষণ পরিমাপ’ (sociometry)। বিভিন্ন গোষ্ঠী বা দলের মধ্যে বাস্তবক্ষেত্রে ব্যক্তি-বিশেষের কার্যাবলী পরিমাপের প্রচেষ্টার জন্মই ইহার এইরূপ নাম দেওয়া হইয়াছে। যেমন, কাহার সহিত ব্যক্তি-বিশেষ একত্র আহার করিতে বা অন্য কোন কার্য করিতে চাহে বা চাহে না, ব্যক্তি-বিশেষ কোন কিছু কিভাবে নির্বাচন করে, ইত্যাদি এই পদ্ধতি দ্বারা নির্ধারণের চেষ্টা হয়। জে. এল্. মোরেনো (J. L. Moreno), জেনিংস ইত্যাদির নাম এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য।

সমাজ-মনোবিজ্ঞান আলোচনার ফলে অনেক প্রকার অস্বাভাবিক ব্যবহারের পরিচয় পাওয়া যায়; সেই কারণে অনেকে আবার সমাজ-মনের আলোচনায় রোগি-পরীক্ষাপদ্ধতিও প্রয়োগ করিয়াছেন।^{১৪}

বিভিন্ন বিজ্ঞান সমাজ-মনোবিজ্ঞানকে সাহায্য করিয়া থাকে; এই সব বিজ্ঞানের উন্নতির সহিত সমাজ-মনোবিজ্ঞানও পরিপুষ্টি লাভ করিতেছে। তাই জ্ঞানরাজ্যে সমাজ-মনোবিজ্ঞান অবদান আরও অধিক হইবে বলিয়া আশা করা যায়।

৪। শিক্ষা-মনোবিদ্যা বা শিক্ষাশ্রয়ী মনোবিদ্যা (Educational Psychology) :

(ক) বিষয়বস্তু :

শিক্ষার ক্ষেত্রে মনোবিজ্ঞান প্রয়োগের ফলে পৃথক্ বিষয় ভাবে শিক্ষা-মনোবিজ্ঞান উদ্ভব হইয়াছে।

^{১৪} W. D. McKinnon, 'The Use of Clinical Method', *Journal of Social Issues* (1946.2), pp. 47-54 দ্রষ্টব্য।

আমাদের অভিজ্ঞতা হইতে আমরা দেখিতে পাই যে, কাহাকেও কোন বিষয় শিখাইবার ইচ্ছা করিলেই শিখান যায় না। যাহাকে কিছু শিখাইতে হইবে, সে সেই বিষয় শিখিবার উপযুক্ত কি না এবং কিভাবে শিখাইলে সে তাহা সহজেই শিখিতে পারিবে—এই দুইটি বিষয় প্রথমেই অনুসন্ধান করিতে হইবে। বলা বাহুল্য, এইজন্য যাহাকে শিখাইতে হইবে তাহার মনের গঠন ও ক্ষমতা সম্বন্ধে জ্ঞান সর্বাগ্রে প্রয়োজন। এইখানেই দেখা দেয় শিক্ষামনোবিজ্ঞার আবশ্যকতা। শিক্ষামনোবিজ্ঞার কার্য কি? ইহার উত্তরে বলা যায়: কোন বিষয় সম্বন্ধে স্পষ্ট ভাবে স্বল্পকালে দীর্ঘস্থায়ী শিক্ষা কিরূপে দান করা যায় এবং উহা গ্রহণকালে শিশু-মন ও কিশোর-মন কিভাবে কার্য করে, তাহা বর্ণনা করাই শিক্ষা-মনোবিদ্যার উদ্দেশ্য।

এখন শিক্ষা-মনোবিজ্ঞার বিষয়বস্তু বিশদভাবে আলোচনা করা যাউক:

(১) শিক্ষা-মনোবিজ্ঞাকে শিশু-মন লইয়া আলোচনা করিতে হইবে, এবং এই প্রসঙ্গে প্রথমে আলোচনা করিতে হইবে শিশুর মন কি পরিমাণে নমনীয় ও পরিবর্তনশীল। শিশু-মনের উপর বংশপ্রভাব (heredity) কতদূর কার্যকরী এবং বাহ্য পরিবেশ (environment) দ্বারা উহা কি ভাবে প্রভাবিত হয়, তাহা জানিতে হইবে।

(২) শিক্ষাদান-কালে ইহা লক্ষ্য করা যায় যে, ছাত্র-ছাত্রীর কতকগুলি বৈশিষ্ট্য জন্মগত বা সহজাত (innate), আবার কতকগুলি বৈশিষ্ট্য অভিজ্ঞতা ও আয়াসলব্ধ (acquired)। সহজাত এবং অভিজ্ঞতালব্ধ বৈশিষ্ট্যগুলির ব্যাপকতা এবং উহাদের সহিত বুদ্ধি, অনুভূতি ও স্মৃতির সম্বন্ধ শিক্ষা-মনোবিজ্ঞার বিবেচ্য বিষয়।

(৩) বিভিন্ন বয়সের বিভিন্ন ছাত্র-ছাত্রীর সকল বিষয়ে শিক্ষালাভের ক্ষমতা থাকে না—এই কারণে শিক্ষণীয় বিষয়ের পর্যায় ও ক্রমবিভাগ প্রয়োজন। সুতরাং শিশু-মন কিরূপে বিভিন্ন স্তরের মধ্য দিয়া ধীরে ধীরে কিশোর মনে পরিণতি লাভ করে, তাহা শিক্ষা-মনোবিজ্ঞা আলোচনা করে।

(৪) যে-কোন বিষয় শিক্ষাদানের প্রধান পথ ইন্দ্রিয়সমুদয়। ইহাদের মাধ্যমেই আমরা প্রত্যক্ষ জ্ঞান লাভ করি। সুতরাং ইন্দ্রিয়লব্ধজ্ঞানের সাধারণ বৈশিষ্ট্য এবং উহাদের কিভাবে শিক্ষা গ্রহণের মাধ্যম হিসাবে ব্যবহার করা যায় তাহা শিক্ষা-মনোবিজ্ঞা আলোচনা করে।

(৫) শিক্ষিতব্য বিষয় একবার আয়ত্ত করাই যথেষ্ট নহে ; পঠিত বিষয়গুলি মনে রাখিতে হইবে। অর্জিত শিক্ষাকে মন কতদূর জাগরুক রাখিতে পারে তাহা জানিবার জন্য স্মৃতিশক্তির স্বরূপ, প্রার্থ্য, উহার উন্নতির উপায় ইত্যাদি বিষয় শিক্ষা-মনোবিজ্ঞান আলোচনা করে।

(৬) শিশু-মন কল্পনাপ্রবণ। এই কল্পনার ভাল-মন্দ দুইটি দিক্ই আছে। এই কল্পনাক্রিয়াকে কিতাকে নিয়ন্ত্রণাধীন করিয়া সুপথে পরিচালিত করা যায় তাহা শিক্ষা-মনোবিজ্ঞান একটি আলোচ্য বিষয়।

(৭) শিশু ও কিশোর মনে অনুভূতির প্রভাব অপরিমিত। সুতরাং শিক্ষককে দেখিতে হইবে কিভাবে সুখকর অনুভূতিগুলি জাগরিত করিয়া শিক্ষার সহায়ক হিসাবে উহাদের ব্যবহার করা যাইতে পারে। এইজন্য শিশু ও কিশোর মনে অনুভূতি ও আবেগের স্থান শিক্ষা-মনোবিজ্ঞানকে জানিতে হইবে।

(৮) শিক্ষাদানের সূচু প্রণালী নিরূপণ করিতে যাইয়া শিক্ষা-মনোবিজ্ঞানকে শিক্ষণ (learning)-এর মূলনীতি কী তাহা জানিতে হইবে। আবার জানার বা শিক্ষণের পথে প্রধান অন্তরায় অবসাদ বা ক্লান্তি (fatigue) ও বিরক্ত (irritability) ; কি করিয়া এইগুলিকে দূর করিয়া শিশুর পক্ষে জ্ঞান-আহরণের পথ মসৃণ করিয়া তুলিতে পারা যায়, তাহাও শিক্ষা-মনোবিজ্ঞান আলোচনা করিবে।

(৯) শিক্ষাদান-কালে শিক্ষকমাত্রেরই ছাত্র-ছাত্রীর বুদ্ধির বিভিন্নতা লক্ষ্য করেন। বুদ্ধির তারতম্য অনুসারে শিক্ষাদান-ব্যাপারেও পার্থক্য করিতে হইবে। সুতরাং বুদ্ধি ‘বস্তু’-টি কী, তাহার পরিমাপ কতদূর ও কিভাবে করা যায় তাহা শিক্ষা-মনোবিজ্ঞান আলোচনা করে।

(১০) বিভিন্ন ক্রীড়ার মধ্য দিয়া কর্মমুখর শিশুর মন আত্মপ্রকাশের চেষ্টা করে। ক্রীড়ার মধ্যে সে প্রাপ্তবয়স্কদের অনুকরণের চেষ্টা করে। সুতরাং ক্রীড়াচ্ছলে তাহাকে শিক্ষাদানের উপায় এবং তাহার অনুকরণীয় আদর্শনির্ধারণ ইত্যাদি বিষয়ও শিক্ষা-মনোবিজ্ঞান আলোচনা করিবে।

(১১) মানবমনের প্ররোভ বা আবেগ, প্রেরণা ও সহজবুদ্ধিগুলি যদি সম্যক প্রকাশলাভের পথ হইতে বঞ্চিত হয়, তাহা হইলে মানবমনের সাম্যভাব

নষ্ট হইয়া যায় এবং বিভিন্ন দুশ্চরিত্র ও অস্বাভাবিকতা দেখা দেয়। মানবমন সম্বন্ধে সাধারণভাবে যাহা বলা হইল, তাহা শিশু-মনের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। সুতরাং শিক্ষকের অগ্রতম কর্তব্য হইল ছাত্র-ছাত্রীর মানসিক স্বাস্থ্যের প্রতি তীব্র দৃষ্টি রাখা। অতএব ইহাও শিক্ষা-মনোবিজ্ঞানের আলোচ্য বিষয়।

(১২) শিক্ষাসমাপনান্তে ছাত্র-ছাত্রীদের মনে দেখা দেয় ভবিষ্যৎ বৃত্তি সম্বন্ধে চিন্তা। সকলেই সকল বৃত্তির উপযোগী নয়। আদর্শ শিক্ষকের কর্তব্য হইল কোন্ ছাত্রের কোন্ বৃত্তির প্রতি অনুরাগ আছে তাহা নিরূপণের প্রচেষ্টা এবং সেই অনুসারে তাহাকে সেই বৃত্তির উপযোগী করিয়া তোলা। সুতরাং কিভাবে ভবিষ্যতের বৃত্তিনির্ধারণে ছাত্রদের সাহায্যদান (vocational guidance) করা যাইতে পারে তাহার আলোচনাও শিক্ষা-মনোবিজ্ঞানের অন্তর্ভুক্ত।

(খ) সংক্ষিপ্ত ইতিহাস :

শিক্ষাবিজ্ঞান (Pedagogy) উন্নতির ফলে শিক্ষাবিৎরা দেখিলেন যে, যান্ত্রিক পদ্ধতিতে কতকগুলি তথ্য গলাধঃকরণ করানোর নাম শিক্ষা নহে। প্রকৃত শিক্ষা দান করিতে হইলে ছাত্র-ছাত্রীর মানসিক গঠন-বৈশিষ্ট্য এবং মানসিক ধর্ম জানা একান্ত প্রয়োজন।

জঁ। জাক্ রুসো (Jean Jaques Rousseau), পেস্টালোৎসি (Pestalozzi) এবং ফ্রোয়েবেল (Froebel) ইত্যাদি শিক্ষাদানের নূতন পদ্ধতি অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। তাঁহারা এইজন্ত মনোবিজ্ঞানের সাহায্য লওয়া একান্ত প্রয়োজন বোধ করেন। এইভাবে শিক্ষাবিজ্ঞান মনোবিজ্ঞানের আলোচনায় প্রবৃত্ত হয়। শিক্ষার ক্ষেত্রে মনোবিজ্ঞানের এই প্রয়োগের ফলে শিক্ষা-মনোবিজ্ঞান নামে মনোবিজ্ঞানের এক পৃথক্ শাখার অভ্যুদয় হয়।

য়োহান্ ফ্রীড্‌রিশ্ হারবার্ট (Johann Friedrich Herbart)-কে শিক্ষা-মনোবিজ্ঞানের আদি পথিকৃৎদের অগ্রতম বলা যাইতে পারে। মনোবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে হারবার্টের প্রধান অবদান হইল সংপ্রত্যক্ষ (apperception)। তিনি দেখান যে, যখন কোন উদ্দীপকের ফলে সংবেদন হয়, তখন আমাদের অভিজ্ঞতা কেবলমাত্র ঐ উদ্দীপকেই সীমাবদ্ধ থাকে না; অবচেতনস্তরে ঐ উদ্দীপকের সহিত সংশ্লিষ্ট

পূর্ব-অভিজ্ঞতার আলোকে ঐ নূতন উদ্দীপকের ব্যাখ্যা হয়। পূর্ব-অভিজ্ঞতার আলোকে নূতন উদ্দীপকের ব্যাখ্যাই নাম সংপ্রত্যক্ষ। হারবার্ট মনে করেন যে, শিশুকে শিক্ষাদানের সময় যদি তাহার পুরাতন অভিজ্ঞতার সাহায্য লওয়া যায়, অর্থাৎ পুরাতন অভিজ্ঞতার মধ্যে যদি নূতন অভিজ্ঞতার আত্মীকরণ (assimilation) হয়, তাহা হইলে সে সহজেই নূতন উদ্দীপক বা নূতন ধারণার অর্থ বুঝিতে পারিবে। যেমন, যে সাগর দেখে নাই, তাহাকে পুষ্করিণী বা নদীর উপমার সাহায্যে উহা বুঝাইতে হইবে। সুতরাং প্রাক্তন অভিজ্ঞতার ভিন্নতা অনুসারে একই উদ্দীপকের প্রয়োগে বিভিন্ন ব্যক্তির মনে বিভিন্ন প্রতিক্রিয়া দেখা দিতে পারে। হারবার্ট সমগ্র শিক্ষা-প্রণালীকে সংপ্রত্যক্ষের উপর ভিত্তি করিয়া রচনা করেন।

কোন বিষয়ে সহজে শিক্ষালাভ করিতে হইলে স্মৃতির প্রাথমিক প্রয়োজন। এবিংহাউস (Ebbinghaus) স্মৃতিসম্বন্ধে অনুসন্ধান-কার্য চালান। তিনি স্বল্প আয়্যাসে কার্যকুশলতা (skill)-লাভের বিষয়ে এবং স্মৃতি-প্রসার (memory span)-বৃদ্ধি ইত্যাদি উপায়ে স্মৃতির উন্নতি বিধানের জন্য কতকগুলি সূত্র আবিষ্কার করেন। শিক্ষার ক্ষেত্রে এইগুলি বিশেষ প্রভাব বিস্তার করে।

গ্যাল্টন্ (Galton)-এর গবেষণাও শিক্ষার ক্ষেত্রে কিছু সহায়তা করে। তিনি আধুনিক প্রশ্নাবলী-প্রণালী (questionnaire method)-এর অনুরূপ পদ্ধতিতে প্রতিকল্প-সমষ্টি (imagery) সম্বন্ধে অনেক অনুসন্ধান চালান (পৃঃ ৬১৪)। তিনি ইন্দ্রিয়গুলি ও উহাদের শক্তি (faculty), স্মৃতি, ক্লান্তি (fatigue), যুথচারিতা বা দলবদ্ধ হইয়া থাকার সহজ প্রবৃত্তি (gregariousness) ইত্যাদি বিষয়ে অনুসন্ধান করেন, এবং ব্যক্তিগত পার্থক্য (individual differences) নিরূপণে তাহার গবেষণা বিশেষ সহায়তা করে। মানসিক প্রলক্ষণ (traits)-এর পারস্পর্য (correlation) সম্বন্ধে গ্যাল্টনের প্রদর্শিত পথে চলেন পিয়ারসন্, বার্ট, টম্‌সন্ এবং স্পিয়ারম্যান।

আল্ফ্রেড্ বিনে (Alfred Binet) বুদ্ধি পরীক্ষার জন্য যে-সব উপায় উদ্ভাবন করেন, সেইগুলিও শিক্ষার ব্যাপারে সহায়তা করে। কারণ

বুদ্ধির তারতম্য অনুসারে কে কোন্ বিষয়ে শিক্ষালাভের উপযোগী তাহা নির্ধারণ করার সুবিধা হয় (৭ম অধ্যায় দ্রষ্টব্য) ।

শিক্ষার অন্ত্যতম উদ্দেশ্য হইল অপরাধপ্রবণতা (delinquency)-নিরোধ এবং চারিত্রিক সংশোধন । এই বিষয়ে উইলিয়াম হিলি (William Healy) এবং সিরিল বার্ট (Cyril Burt)-এর উত্তম উল্লেখযোগ্য ।

শিশু-বিদ্যালয়ে কঠোর শাস্তি-বিধানের প্রথা তুলিয়া দিয়া “মুক্ত আব-হাওয়ার” মাধ্যমে শিশুকে রাখিলে তাহার স্বাভাবিক বৃত্তি (natural faculties) প্রকাশ পায় । এই অভিমত রুশো, ফ্রোয়েবেল, মন্টেসরি ইত্যাদি অনেকেই প্রকাশ করেন । ইংলণ্ডে এই মতবাদ সমর্থন করিয়া আন্দোলন চালান নীল (Neill), বার্ট্রাণ্ড রাসেল ও তাঁহার দ্বিতীয় পত্নী ডোরা রাসেল ।

সুসান আইজাক্স (Susan Isaacs) শিশুর বয়ঃক্রম অনুসারে তাহার মনের ও বুদ্ধির কিরূপ তারতম্য ঘটে তাহা লইয়া পাণ্ডিত্যপূর্ণ আলোচনা করিয়াছেন তাঁহার *Intellectual Growth in Young Children* নামক গ্রন্থে ।

কৈশোর ও বয়ঃসন্ধিক্ষণ (adolescence) সম্বন্ধে আলোচনা শুরু করেন ষ্ট্যান্‌লি হল (১৯০৪ সালে) ; তাঁহার পরে কোলে (Cole), ক্রাম্পটন (Crampton), ডিয়ারবর্ন (Dearborn), রথ্‌নে (Rothney), বার্ট ইত্যাদিও এই বিষয়ে যথেষ্ট আলোচনা করিয়াছেন ।

শিশুর নিজর্গন বা অবচেতনস্তর ও পরবর্তী জীবনে উহার প্রভাব সম্বন্ধে মনঃসমীক্ষণবাদীদের আলোচনা শিশু-শিক্ষার সমস্যা-সমাধানে যথেষ্ট আলোকপাত করিয়াছে ।^{১৫}

৫। শিল্পীয় মনোবিদ্যা (Industrial Psychology) :

(ক) বিষয়বস্তু :

শিল্পীয় উৎপাদনের জন্ত যে কেবল যন্ত্র ও উপাদানের প্রয়োজন তাহা নহে ; প্রতি উৎপাদনের পশ্চাতে আছে মানবমন । শিল্পীয় উৎপাদনের

১৫ শিশু-মনোবিজ্ঞান যাহাদের অবদানের কথা পূর্বে উল্লেখ করা হইয়াছে তাঁহারা সকলেই শিক্ষা-মনোবিজ্ঞান উন্নতিতে সহায়তা করিয়াছেন ।

পশ্চাতে যে-সব মানুষেরা কাজ করে তাহারা আমাদেরই মত। আশা-আকাঙ্ক্ষা, আবেগ, প্ররক্তি, পটুত্ব ইত্যাদি সব কিছুই তাহাদের আছে; আবার এই সব বিষয়ে তাহাদের পরম্পরের পার্থক্যও আছে। উপাদানের পশ্চাতে এই সব ‘মানবীয় উপাদান’ (human materials)-এর মানসিক শক্তি ও যোগ্যতা নির্ধারণ এবং তদনুসারে শিল্পোপাদানে সহায়তা দানের প্রচেষ্টা হইতে ‘শিল্পীয় মনোবিদ্যার’ উদ্ভব হইয়াছে।

শিল্পীয় মনোবিজ্ঞান সমস্যাগুলি মোটামুটি দুই ভাগে ভাগ করা যায়—কতকগুলি কার্য-সম্বন্ধীয় এবং বাকীগুলি কর্মী বা শ্রমিক সম্বন্ধীয়। অবশ্য ইহারা পরস্পর জড়িত।

শ্রমিক বা কর্মীর কর্মদক্ষতা বাড়াইতে হইলে যাহা কর্মীর মনে ক্লান্তি ও বিরক্তির সৃষ্টি করে তাহা দূর করিতে হইবে এবং যাহা তাহাকে আকৃষ্ট করে তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে। এই অবস্থা কিভাবে আনয়ন করা যায় তাহা জানিবার জন্য মনোবিজ্ঞান সাহায্য লইতে হয়। সুতরাং মনোবিজ্ঞানকে নিম্নলিখিত প্রশ্নের উত্তর দানের চেষ্টা করিতে হয় :

- (১) শিল্পায়তন ও শিল্পক্ষেত্রের পারিপার্শ্বিক উন্নতিবিধান কি করিয়া করা যাইবে ?^{১৬}
- (২) একই প্রকারের কার্য দিনের পর দিন করিয়া যাইলে শ্রমিকের মনে বিরক্তি দেখা দিবে ; সুতরাং কিভাবে কার্যে বৈচিত্র্য আনা যায় ?
- (৩) উপযুক্ত কোন্ বেতনে শ্রমিকের মানসিক তৃপ্তি আসিতে পারে ? শ্রমিকের আহার, বাসস্থান ইত্যাদির ব্যবস্থা কিরূপ হওয়া উচিত ?
- (৪) শ্রমিকদের পরস্পরের মনে কিভাবে সৌহার্দ্য এবং সুষ্ঠু প্রতিযোগিতার ভাব আনা যায় ?

১৬ উত্তরে বলা যায় যে, প্রয়োজনমত শীতাতপ-নিয়ন্ত্রণ, উজ্জ্বল আলোর ব্যবস্থা, কর্কশ ও তীক্ষ্ণ শব্দের হ্রাস ইত্যাদি দ্বারা পারিপার্শ্বিক অবস্থার উন্নতিবিধান করা যাইতে পারে।

আবার বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে বিশেষ বিশেষ ব্যবস্থার প্রয়োজন হইতে পারে। যেমন, একজন খর্বাকৃতি লোককে হয়ত’ কারখানায় পায়ে করিয়া একটি যন্ত্র ক্রমাগত টিপিতে হয় এবং টিপিবার জায়গাটি একটু উঁচুতে। ইহাতে তাহাকে অতিরিক্ত পরিশ্রম করিতে হয়। কিন্তু যদি ঐ শ্রমিকটির মাটিতে না দাঁড়াইয়া একটু উঁচু জায়গায় (ছোট ‘প্ল্যাটফর্ম’) দাঁড়াইবার ব্যবস্থা করা হয়, তাহা হইলে তাহার পা’কে কেবল উঁচুতে তুলিবার পরিশ্রম কম হয় ; এবং এই দ্বারা তাহার কর্মক্ষমতা বৃদ্ধি পাইবে, অন্ততঃ ক্লান্তির সম্ভাবনা কমিয়া যাইবে।

(৫) শ্রমিকের দেহযন্ত্রকে সবল রাখিবার জন্য ক্রীড়াদির ব্যবস্থা কিরূপ করা যাইতে পারে ?

(৬) দেহযন্ত্রকে অটুট রাখিতে যেমন পরিশ্রমের প্রয়োজন, সেইরূপ দেহযন্ত্রের বিশ্রামেরও প্রয়োজন। এই বিশ্রামদানের জন্য কি করা উচিত ? দিনে কয় ঘণ্টা পরিশ্রম করা উচিত ? কয় ঘণ্টা নিদ্রার প্রয়োজন ?

(৭) শ্রমিক ও মালিকের মধ্যে সৌহার্দ্য ও সম্প্রীতির ভাব কি করিয়া স্থাপন করা যায় ? কি ভাবে ধর্মঘটের সম্ভাবনা প্রতিরোধ করা যায় ?

(৮) আকস্মিক দুর্ঘটনা (accident) কেন ঘটে ? উহার প্রতিরোধের কী উপায় ?

এক একজন ব্যক্তির এক এক প্রকার কার্য করিবার ক্ষমতা আছে। সকলে সকল কার্যের উপযুক্ত নহে। সুতরাং শিল্পীয় মনোবিজ্ঞাকে আবার নিম্নলিখিত প্রশ্নের সম্মুখীন হইতে হয় :

(১) ব্যক্তিগত যোগ্যতা নির্ধারণের মান কি ?

(২) কাহার কোন্ কার্যের প্রতি অনুরাগ আছে, তাহা কি করিয়া স্থির করা যাইবে ?

(৩) শ্রমিকের আবেগ, প্রবৃত্তি ইত্যাদি কিভাবে এবং কতদূর তাহার কার্য-কুশলতাকে প্রভাবিত করে ?

(৪) ব্যক্তিগত পার্থক্য কিরূপে নিরূপণ করা যায় ? বয়সের পার্থক্য, যৌন পার্থক্য, জাতিগত পার্থক্য ইত্যাদির প্রভাব কিরূপ ?

(৫) চা ও কফি পান, মদ্যপান, ধূমপান ইত্যাদির ফল শ্রমিক জীবনের উপর কিরূপ ?^{১৭}

১৭ আমরা উপরে শিল্পীয় মনোবিজ্ঞার বতবস্তুলি প্রধান সমস্তার উল্লেখ করিলাম। মনোবিজ্ঞার প্রসারের সহিত শিল্পীয় মনোবিজ্ঞাও ব্যাপকতা লাভ করিতেছে। বিজ্ঞাপন দ্বারা কিভাবে ক্রেতার মনোযোগ আকর্ষণ করা যায়, বিক্রয়কারী কিভাবে বিক্রয়-কার্যে দক্ষতা অর্জন করিতে পারে (অর্থাৎ ইংরাজীতে যাহাকে বলে salesmanship) তাহাও শিল্পীয় মনোবিজ্ঞা আলোচনা করে। মোট কথা, শ্রমিক, মালিক, বিক্রেতা ও ক্রেতা—এই চারি দলের মনোভাব লইয়াই শিল্পীয় মনোবিজ্ঞা অনুসন্ধান কার্য চালায়। আভেলিং (Aveling) এই বিষয়ের উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন : "...Psychology has much to offer to worker, employer, distributor, salesman and even consumer.... Our increasing knowledge of will and character-qualities will be found as applicable to industrial conditions as our knowledge of intelligence and special aptitudes has already been...An illustration may already be found in the psychology of advertising and salesmanship." (*An Outline of Modern Knowledge*, Ed. by W. Rose, p. 346).

সংক্ষিপ্ত ইতিহাস :

শিল্পী ও শ্রমিকদের সমস্যা লইয়া কিছু কিছু আলোচনা বহু পূর্ব হইতেই চলিতেছিল। ১৫৬৭ সালে *Miners' Sickness* নামে এক পুস্তিকা প্রকাশিত হয়। সপ্তদশ শতাব্দীতে *Ramazzini Diseases of Tradesmen* নামক গ্রন্থ রচনা করেন। তবে মনোবিজ্ঞান দৃষ্টিভঙ্গী হইতে শিল্পী-মন সম্বন্ধে আলোচনা আরম্ভ হয় অতি আধুনিক কালে। সাধন (practice) এবং তাহার ফলে ক্লান্তি (fatigue) লইয়া আধুনিক কালে আলোচনা শুরু করেন এমিল্ ক্রেপেলিন্ (Emil Kraepelin)। ইনি ছিলেন ভুওর্টের ছাত্র। ক্লান্তি, ক্ষুধা, মাদকদ্রব্য গ্রহণ ইত্যাদির ফলে কী মানসিক বৈলক্ষণ্য দেখা যায় তাহা লইয়া তিনি গবেষণা করেন। তাঁহার গবেষণাগারে সাধন ও ক্লান্তি সম্বন্ধে অনেক মূল্যবান উপাত্ত পাওয়া যায়। তাঁহার পরে অনেকে—যথা, আরাই (Arai),^{১৮} ফিলিপ্‌স্, এন্ট্‌ভিস্ম্লে (Entwistle), ফ্লুগেল (Flugel) ইত্যাদি—ক্লান্তি সম্বন্ধে গবেষণা চালান। তবে প্রথম মহাযুদ্ধের সময় হইতেই শিল্পীয় মনোবিজ্ঞান পৃথক্ সত্তা স্বীকৃত হয়; কারণ, যুদ্ধের সময় বিশেষ বিশেষ কার্যের জন্য উপযুক্ত কুশলী লোকের নির্বাচন একান্ত প্রয়োজন। সেইজন্য যোগ্য লোকের নির্বাচনে মনোবিজ্ঞান সাহায্য অত্যাবশ্যক হইয়া পড়ে।^{১৯} তাহার পর আমেরিকা ও ইউরোপের প্রায় সকল দেশেই শিল্পের প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে শিল্পক্ষেত্রে মনোবিদের সাহায্য লওয়া হইতে লাগিল। ইংলণ্ডে দুইটি প্রতিষ্ঠান আছে যাহা শিল্পক্ষেত্রে মনোবিজ্ঞান প্রয়োগ লইয়া অনুসন্ধান চালায়। একটি হইল সরকারী প্রতিষ্ঠান—নাম Industrial Health Research Board; আর একটি হইল বে-সরকারী প্রতিষ্ঠান, ১৯২০ সালে সি. এন্স. মায়ার্স

১৮ আরাই ক্লান্তি সম্বন্ধে একটি অভিনব পরীক্ষা করেন। তিনি কয়েক দিন ধরিয়া বার ঘণ্টা করিয়া একটির পর একটি চতুরঙ্গ সংখ্যাকে অপর একটি চতুরঙ্গ সংখ্যা দিয়া গুণ করিয়া দেখিলেন মানসিক ক্লান্তি কতদূর আসে।

১৯ প্রথম মহাযুদ্ধের সময় শিল্পক্ষেত্রে ক্লান্তি ও দক্ষতা (efficiency) সম্বন্ধে বিভিন্ন পরীক্ষণের বর্ণনা পাওয়া যাইবে ভার্ণন (Vernon)-প্রণীত *Industrial Fatigue and Efficiency*-নামক গ্রন্থে।

(C. S. Myers) কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত—নাম National Institute of Industrial Psychology ।

শিল্পীয় মনোবিদ্যা সম্বন্ধে প্রথম উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ হইল ম্যুয়েন্স্টেব্‌বের্গ-রচিত *Psychology and Industrial Efficiency*—ইহা ১৯১৩ সালে প্রথম প্রকাশিত হয়। ইহার পর কর্মক্ষেত্রের বাস্তব সমস্যা সম্বন্ধে অনুসন্ধান যাহারা চালান তাঁহাদের ভিতর টেলর এবং গিলব্রেথ (Taylor ও Gilbreth)-এর নাম উল্লেখযোগ্য ; এবং কর্মীর মানসিক অবস্থার প্রভাব সম্বন্ধে আলোচনাকারীদের মধ্যে এম্. কুল্পিন্ (M. Culpin) ও মে স্মিথ্ (May Smith)-এর নাম করা যাইতে পারে। দুর্ঘটনার কারণ ও প্রতিরোধ সম্বন্ধে আলোচনা আরম্ভ করেন আমেরিকার স্লোকোম্ব (Slocombe) ও তাঁহার সহকর্মীগণ। প্রতি কর্মীর ব্যক্তিগত জীবন ও কার্যের উপর সমগ্র গোষ্ঠীর প্রভাব (group influence), কর্মক্ষেত্রে বিশ্রামের প্রয়োজনীয়তা, বৈচিত্র্যশৃঙ্খলির আবশ্যকতা ইত্যাদি বিষয়ে মৌলিক গবেষণা করেন হার্বার্ডের জি. ই. মেয়ো (G. E. Mayo) এবং তাঁহার সহকর্মী রোয়েথলিস্‌বের্গের (Roethlisberger) ও ডিক্‌সন্ (Dickson)। বর্তমানে বহু মনোবিৎ মনোবিদ্যার এই শাখায় গবেষণা করিতেছেন।

৬। অস্বভাবি-মনোবিদ্যা (Abnormal Psychology) :

(ক) বিষয়বস্তু :

মনোবিদ্যার যে শাখা অস্বভাবী বা অস্বাভাবিক মনের বৈচিত্র্য লইয়া আলোচনা করে, তাহাকে অস্বভাবি-মনোবিদ্যা আখ্যা দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু প্রশ্ন হইতেছে ‘অস্বভাবি-মন’ কাহাকে বলে?

স্বাভাবিক ও অস্বাভাবিকের মধ্যে কোন স্পষ্ট সীমারেখা টানা যায় না। একজন এক বিষয়ে স্বাভাবিক ব্যবহার দেখাইতে পারে, অথচ অপর কোন ব্যাপারে সেই একই ব্যক্তি অস্বাভাবিক ব্যবহার দেখাইতে পারে। ব্যবহারের যে সাধারণ মান আছে তাহা হইল স্বাভাবিক, স্বভাবী বা স্বমিত (normal); আর তাহা হইতে অত্যধিক ব্যতিক্রমে যে ব্যবহার প্রকাশ পায়, তাহাই হইল অস্বাভাবিক বা অস্বভাবী

(abnormal)। যেমন, কোন গোষ্ঠীর সাধারণ ব্যবহারের (average behaviour of the group) তুলনায় কোন ব্যক্তি বিচিত্র ব্যবহার দেখাইলে তাহা অস্বভাবী ব্যবহার। আবার একজন ব্যক্তি দৈনন্দিন জীবনে সচরাচর যে ব্যবহার দেখাইয়া থাকেন, তাহাই হইল তাঁহার স্বাভাবিক ব্যবহার এবং উহার বিশেষ ব্যতিক্রম ঘটিলে উহা হইবে তাঁহার পক্ষে অস্বভাবী ব্যবহার।

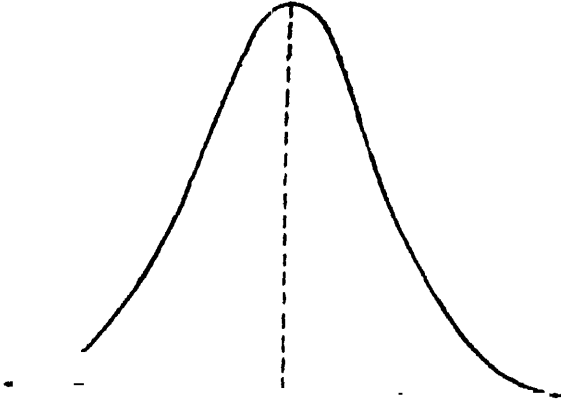
অস্বভাবী মন বলিতে অনেকে কেবলমাত্র অস্থস্থ মন, বাতুল বা পাগলের মন বা অবাঞ্ছনীয় মানসিক অবস্থা বুঝিয়া থাকেন ; এগুলি অস্বাভাবিকতার লক্ষণ সন্দেহ নাই—কিন্তু এইগুলি অপর-স্বভাবী (sub-normal)। অ-স্বভাবী মন বলিতে আবার পর-স্বভাবী বা অতিস্বভাবী (super-normal) মনও বুঝায় ; যেমন, প্রতিভাশালী ব্যক্তিও (genius) ‘স্বাভাবিক’ ব্যক্তিদের গোষ্ঠীর বহির্ভূত বলিয়া ‘অস্বভাবী’ রূপে গণ্য হইবেন। স্মৃতিভ্রংশতা যেমন অস্বভাবী বৃত্তি, সেইরূপ স্মৃতির অতিপ্রার্থও অস্বভাবী।

অস্বভাবী বলিতে কেবলমাত্র মানসিক রোগগ্রস্ত (pathological) বুঝায় না। মানসিক রোগীরা অ-স্বভাবী বটেই ; তাহা ছাড়া, সাধারণ ব্যতিক্রম (চলতি ভাষায় যাহাকে ‘ছিট’ বলে এবং ইংরাজীতে যাহাকে idiosyncrasy বলে) ও মূঢ়াদোষও অস্বভাবী মনের পরিচায়ক। যে চিত্তভ্রংশী বাতুলতা (dementia praecox) বা খেদোন্মস্থ বাতুলতা (manic depressive insanity) রোগে ভুগিতেছে সেও যেমন অস্বভাবী, সেইরূপ কোন কিছু স্মরণ করিতে যে কেবলই মাথা চুলকায, অথবা রোগের ভয়ে যে কেবলই ঔষধ খায়, বা পাছে নিজেকে অসুন্দর দেখায় বলিয়া যে সর্বদাই সাজপোষাক করিয়া থাকে সেও অস্বভাবী।

আবার কেহ কেহ মনে করেন যে, অস্বভাবী ব্যক্তি মাত্রই অবাঞ্ছিত ব্যক্তি। একথা সত্য যে, অপরাধপ্রবণতা ইত্যাদি অস্বাভাবিক মনোবৃত্তি অবাঞ্ছনীয় ; কিন্তু স্মৃতিদোর্বল্যে যিনি ভুগিতেছেন তাঁহাকে অবাঞ্ছিত লোক বলা অত্যায হইবে।

এই প্রসঙ্গে বলা যাইতে পারে যে, পরিসংখ্যান বিজ্ঞানের দৃষ্টিভঙ্গী হইতে ‘স্বাভাবিক’ (normal) পদটির পরিমাণগত (quantitative) ব্যাখ্যা দেওয়া হয়। কোন প্রলক্ষণ (trait)-কে স্বাভাবিক বলা হয়, যদি উহা

কোন 'গোষ্ঠীর কেন্দ্রিক প্রবণতা' (central tendency of the group) বা 'গড়পড়তা' (average) নির্দেশ করে। কোন গোষ্ঠীর মধ্যে কোন প্রলক্ষণ (trait) যখন স্বাভাবিকভাবে বণ্টিত (distributed) থাকে, তখন উহার বিভিন্ন পরিমাণের অন্তিস্থকে চিত্রলেখ বা গ্রাফ (graph)-এ যে সমস্ত বিন্দু দ্বারা চিহ্নিত করা হয়, তাহাদের যোগ দিলে একটি ঘণ্টাকৃতি



স্বাভাবিকতার নির্দেশক ঘণ্টাকৃতি বক্ররেখা
(Normalcy Curve)

প্রতি সাম্য বিশিষ্ট-বক্ররেখা (bell-shaped symmetrical curve) পাওয়া যায়। উহাকে বলা হয় 'স্বাভাবিকতা নির্দেশক রেখা' (normalcy curve)।

অবশ্য ইহা হইল আদর্শ; সকল বাস্তব ক্ষেত্রে যে রেখাটি প্রতিসাম্য বিশিষ্ট হইবে তাহা নহে—ইহা একদিকে

অসমভাবে বক্র (skewed) হইয়া যাইতে পারে। যাহা হউক, যদি কোন প্রলক্ষণের পরিমাণ ঘণ্টাকৃতি রেখার বাহিরে পড়ে, তাহা হইলে উহা হইবে 'অস্বাভাবিক' (anormal বা abnormal)^{২০}।

আমরা উপরে 'অস্বভাবী' পদের ব্যাপক ও বৈজ্ঞানিক অর্থ আলোচনা করিলাম। তবে অস্বভাবি-মনোবিজ্ঞান লেখকেরা যে তাঁহাদের গ্রন্থে সকল ক্ষেত্রে অস্বভাবী মনের সহিত পরস্বভাবী বা প্রতিভাশালী মনেরও আলোচনা করিয়াছেন তাহা নহে। বর্তমান শতকের প্রারম্ভে জ্যাকোবো

২০. পরিসংখ্যান বিজ্ঞান (Statistics)-এর দৃষ্টিভঙ্গী হইতে 'স্বাভাবিকতা' ও 'অস্বাভাবিকতা' এই পদদ্বয়ের স্মৃষ্টি ব্যাখ্যা দিয়াছেন J. W. Bridges তাঁহার *Psychology: Normal and Abnormal* নামক গ্রন্থে (উহার পৃ: ১৪-২৭ দ্রষ্টব্য)।

এই প্রসঙ্গে প্রশ্ন উঠিতে পারে: অস্বভাবী কে? উত্তরে বলা যাইতে পারে, আমরা প্রত্যেকেই অস্বভাবী—সবাই 'পাগল'। কেহ সাজপোষাকে, কেহ পড়াশুনায়, কেহ খাওয়া-দাওয়ায়, কেহ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার ব্যাপারে, কেহ অপরের মনোযোগ আকর্ষণের চেষ্টায়, কেহ নেশার ব্যাপারে, কেহ স্নেহ, প্রেম, ক্রোধ, ভয় ইত্যাদি আবেগের ক্ষেত্রে 'পাগল'! তবে সকল ক্ষেত্রেই এই 'পাগলামি' বা অস্বাভাবিকতা একরূপ তীব্র আকারের হয় না যে তাহার জন্ত ব্যক্তি-বিশেষকে উদ্ভাদাগারে আশ্রয় লইতে হয়। (তুলনীয়: "Every person is abnormal in some respects")।

(Jastrow) অস্বভাবি-মনোবিজ্ঞান বিষয়বস্তু নির্ধারণ করিয়া বলিয়াছেন যে, নিম্নলিখিত বিষয়গুলি ইহার অন্তর্ভুক্ত^{২১} :

(১) বিভিন্ন প্রকারের অধ্যাস ও অমূল প্রত্যক্ষ (illusion and hallucination) ।

(২) সমাধি (trance), সংবেশন (hypnotism), স্বতঃক্রিয়া (automatism) ।

(৩) মাদকদ্রব্য গ্রহণ এবং মনের উপর উহার প্রতিক্রিয়া এবং অস্বস্থ দেহের অবস্থা (psychic effects of drugs and intoxicants and of diseased bodily conditions)

(৪) বার্ধক্যাবস্থায় ক্ষমতার দৌর্বল্য (impairment of the faculties in old age) ।

(৫) সামাজিক অব্যবস্থায় বা অন্য কোন তীব্র উত্তেজনার প্রভাবে (যথা, ভয় ও অন্য কোন ‘মানসিক সংক্রমণ’-এর ফলে) ব্যক্তি-বিশেষের অথবা গোষ্ঠী-বিশেষের অস্বাভাবিক মানসিক বিকার ।

(৬) সাধারণ নীতি বা বুদ্ধির অগোচর বাস্তব বা কাল্পনিক কোন অতীন্দ্রিয় সত্তার প্রকাশ । (যথা, আবেগ, দূরস্থ মনের সহিত সংযোগ বা telepathy) ।

(৭) কোন মানসিক শক্তির ব্যাহত প্রকাশ অথবা বিনাশ, যাহার ফলে মানসিক অস্বস্থতা বা বাতুলতা দেখা যায় ।

বিভিন্ন লেখক কর্তৃক ‘অস্বভাবী’ পদটি এইরূপ সঙ্কীর্ণ অর্থে ব্যবহৃত হওয়ার ফলে একমাত্র মানসিক রোগের এবং অবর-স্বভাবী (subnormal) লক্ষণের আলোচনাই অস্বভাবি-মনোবিজ্ঞান বিষয়বস্তু হইয়া পড়িল ।^{২২}

যদিও বর্তমান শতাব্দীর প্রারম্ভে ‘অস্বভাবি-মনোবিজ্ঞান’ কথা খুব শুনা যাইত, অতি আধুনিক কালে এই নামটি বেশী ব্যবহৃত হয় না । মনঃসমীক্ষণ

^{২১} *Dictionary of Philosophy and Psychology* (Macmillan, New York, 1901) দ্রষ্টব্য ।

^{২২} ডঃ ম্যাকডুগাল তাঁহার *Outline of Abnormal Psychology* গ্রন্থে (পৃঃ ১) ‘abnormal psychology’ পদটি সঙ্কীর্ণ অর্থে ব্যবহার করিয়াছেন ; তিনি বলেন যে, ইহার বিষয়বস্তু হইল ‘মনের কামিক বিকলতা’ । তাঁহার ভাষায় : “I ask the reader to pardon my use of the expression ‘abnormal psychology’ in the restricted sense of psychology of functional disorders.”

(psychoanalysis)-এর প্রসারের ফলে 'স্বভাবী' ও 'অস্বভাবী'-র মধ্যে পার্থক্য ক্রমশঃ কমিয়া আসিতে লাগিল এবং পৃথকভাবে অস্বভাবি-মনের আলোচনার প্রয়োজনীয়তা বেশী রহিল না। আবার রোগি-পরীক্ষামূলক মনোবিজ্ঞান (Clinical Psychology)-র উদ্ভবের সহিত অস্বভাবি-মনোবিজ্ঞান প্রয়োগের ক্ষেত্রে উহা আধিপত্য বিস্তার করিতে লাগিল। অবশ্য মনোবিজ্ঞান এই দুই শাখার বিষয়বস্তু ও দৃষ্টিভঙ্গী সম্পূর্ণরূপে এক হইতে পারে না, কারণ রোগি-পরীক্ষামূলক মনোবিজ্ঞান চিকিৎসা-শাস্ত্রের প্রসার বা বিভাগ এবং উহা চিকিৎসকের আলোচ্য বস্তু।

যাহা হউক, বর্তমান পরিস্থিতিতে অস্বভাবি-মনোবিজ্ঞান প্রভাব ও পৃথক অস্তিত্বের প্রয়োজনীয়তা যথেষ্ট হ্রাস পাইয়াছে।^{২৩}

(খ) সংক্ষিপ্ত ইতিহাস :

মানুষের সৃষ্টি যতদিন হইয়াছে, ততদিনই কোন না কোন মানুষের মানসিক বিকার দেখা দিয়াছিল। এই বিকারকে বিভিন্ন সময়ে মানুষ বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গী হইতে দেখিয়াছে।^{২৪} সাধারণ লোকের দৃষ্টিভঙ্গীর এই বিভিন্নতা মনোবিজ্ঞান দৃষ্টিভঙ্গীকেও প্রভাবিত করিয়াছে।

পূর্বে মনোবিদরা মনে করিতেন যে, মন বলিতে স্বভাবী মন (normal mind)-ই বুঝায়; সুতরাং তাহারা অস্বভাবী মনের আলোচনা করিতেন না।

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে মেসমের (Mesmer) মানসিক রোগীদের উপর হস্ত সঞ্চালন করিয়া তাহাদের রোগনিরাময় করিতেন। তিনি বিশ্বাস করিতেন যে, এক অদৃশ্য শক্তি (যাহার নাম তিনি দিয়াছিলেন

২৩ A. A. Roback-এর ভাষায় : "Abnormal psychology has now been assigned a minor role in a larger organisation whereas before it constituted the whole division." (*Present-day Psychology*, p. 356).

২৪ পূর্বে মনে করা হইত যে, কোন অতীন্দ্রিয় সত্তার প্রভাবে (যেমন, দেবরোষে অথবা ভূত-প্রেতাদির দ্বারা আবিষ্ট হওয়ার কালে) মানসিক রোগ দেখা যায়। এমন কি আধুনিক কালেও কাহারও কাহারও মনে এই বিশ্বাস ছিল। লাইপ্‌ৎসিগ্‌ বিশ্ববিদ্যালয়ের ভেবজবিজ্ঞান অধ্যাপক হাইনরখ্‌ ১৮১৮ সালে বলিয়াছিলেন : "Where God is, there is strength, light, love and life. An evil spirit abides, therefore, in the mentally deranged ; they are the truly possessed."